আল আকসা

মসজিদের ইতিকথা

এ.এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আল আকসা মসজিদের ইতিকথা

تاريخ المسجد الأقصى

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
ড.মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রথম	:	এপ্রিল ১৯৯২
চতুর্থ প্রকাশ	:	যুলহিজ্জা ১৪৩৬
		আশ্বিন ১৪২২
		সেপ্টেম্বর ২০১৫

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : আশি টাকা

Al Aqss Masjider Itikatha Written by A.N.M Sirajul Islam & Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition April1992, 4th Edition September 2015 Price Taka 80.00 only.

প্রকাশকের কথা

ফিলিস্তিনের প্রাণকেন্দ্র জেরুসালেম অসংখ্য নবী-রাসূলের (আ) ইসলামী দাওয়াহর কেন্দ্র ছিলো বলে দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে তা অতি প্রিয় একটি স্থান। এ পবিত্র শহরেই রয়েছে আল আকসা মসজিদ যা বিশ্ব মুসলিমের প্রথম কিবলাহ্ হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল আকসা মসজিদের পাশেই রয়েছে সাখরা বা পাথর, যেখান থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) শুরু করেছিলেন আকাশমুখী সফর। যে তিনটি মসজিদের দিকে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সফর করার জন্য মহানবী (সা) উৎসাহিত করেছেন তার একটি হচ্ছে এই আল আকসা মসজিদ।

দুঃখের বিষয়, জেরুসালেম আজ ইহুদীদের করতলগত। ইহুদীরা আল আকসা মসজিদ ও গম্বুজে সাখরা ধ্বংস করে সেখানে তাদের নিজস্ব ইবাদাতগাহ্ তৈরির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থে জনাব এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম আল আকসা মসজিদের অতীত ও বর্তমান এবং একে ধ্বংস করার জন্য ইহুদীদের চক্রান্তের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। ভুলে যাওয়া অনেক কথা লিখক ইতিহাসের পাতা থেকে নতুনভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য পাঠ্য বলেই আমরা মনে করি।

সূচীপত্র

আল আকসা মসজিদ

সাখরা মসজিদ

জেরুসালেমের বিভিন্ন নাম

মুসলমানদের কাছে জেরুসালেম শহর 'আল-কুদ্‌স' নামে পরিচিত। এর অন্য নাম হচ্ছে বাইতুল মাকদিস। 'আল-কুদ্‌স' নামটাই সর্বাধিক পরিচিত।

যদিও কোনটার উপর কোনটার প্রাধান্যের বিশেষ কারণ নেই। মসজিদে আকসাকেও কুদ্‌স বলা হয়।

'কুদ্‌স' শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র। পক্ষান্তরে, 'বাইতুল মাকদিস' শব্দের অর্থ হচ্ছে, 'হাইকালে সুলাইমানী' বা সুলাইমান (আ)-এর তৈরি ইবাদাতগাহ।[১] হিব্রু শব্দ Bethammiqdash থেকে 'মাকদিস' শব্দের উৎপত্তি। 'মাকদিস' শব্দের মূলেও 'কুদ্‌স' শব্দ রয়েছে। মূলকথা হল, এটি পবিত্র শহর। এই শহরেই প্রখ্যাত আল আকসা মসজিদ রয়েছে।

এই শহরের অন্যান্য নামগুলো হচ্ছে, 'মাদীনাতুল হক' (সত্যের শহর), 'মাদীনাতুল্লাহ' (আল্লাহর শহর), 'আল-মাদীনাহ্‌ আত-তাহিরাহ' (পবিত্র শহর) এবং 'আল-মাদীনাহ আল-মুকাদ্দাসাহ' (পবিত্র শহর)। 'জেরুসালেম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'ইউরোসালেম' শব্দ থেকে। রোমানরা জেরুসালেমকে এই নামেই অভিহিত করে। *মু'জাম আল-বুলদানের* লেখক ইয়াকুত হামাওয়ী এর আরেকটি নাম উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে, 'আল-বালাত'। অর্থ হল, রাজপ্রাসাদ।

'ইউরোসালেম' একটি কেনানী শব্দ। আরব ইয়াবুসী গোত্রের ১ম শাসকের উপাধি ছিল 'সালেম'। সালেম অর্থ শান্তিপ্রিয়। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন বলে তাঁকে সবাই এই উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর আসল নাম ছিল মালিক সাদেক। তাঁর এই কেনানী নামানুসারে শহরের নামকরণ করা হয় ইউরোসালেম।[২] বর্তমান যুগে, এটাকেই জেরুসালেম বলা হয়। খৃস্টপূর্ব ৩ হাজার সালে আরবের ইয়াবুসী গোত্রের বসবাসের ভিত্তিতে এই শহরের প্রাচীন নাম হচ্ছে 'ইয়াবুস'।

---

১. আল-মো'জাম আল-ওয়াসীত-২য় খণ্ড, মাজমাউল লুগাহ আল-আরাবিয়াহ, কায়রো থেকে প্রকাশিত।

২. আল-আকসা ওয়াল কুদস, আল ফাতাহ মুক্তি সংস্থার পুস্তিকা, সৌদী আরব, ১৩৯৬ হিজরী।

বর্ণিত আছে, ইয়াবুসী শাসক জেরুসালেমে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বাগত জানান এবং আঙ্গুর ও রুটি দিয়ে তাঁর মেহমানদারী করেন।[৩]
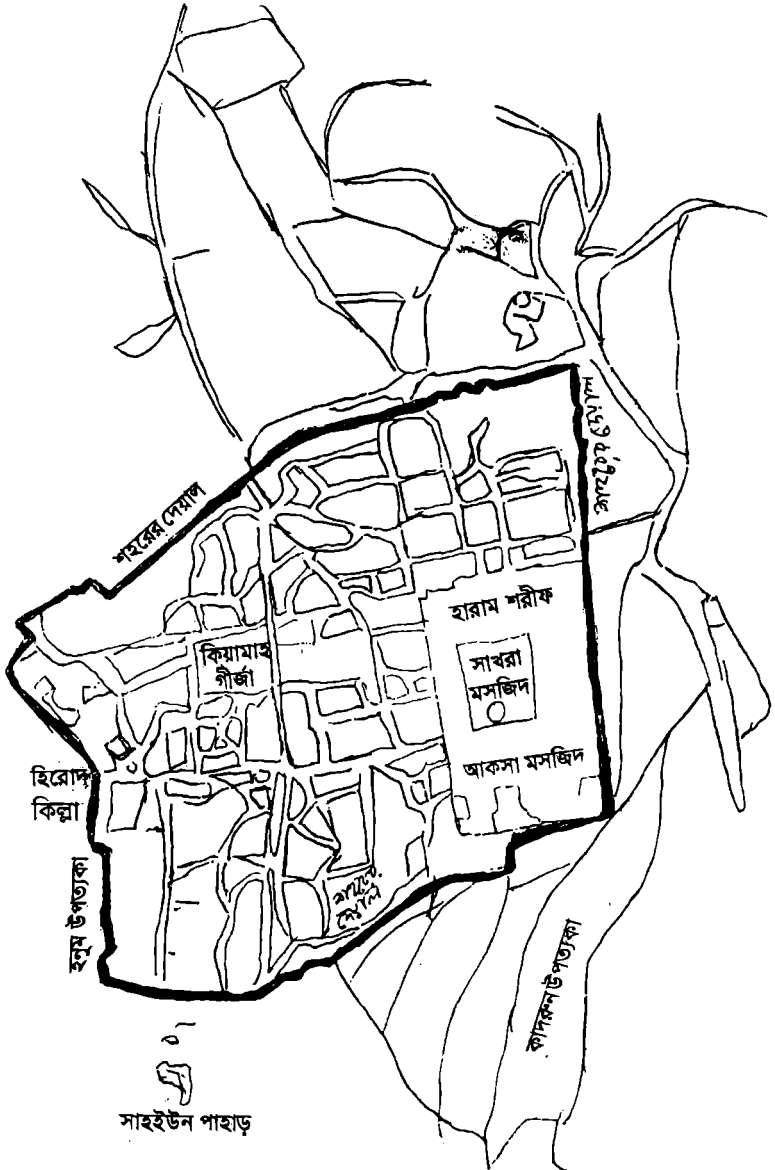
পুরাতন জেরুসালেম শহরের বর্তমান দেয়ালের সীমানা

ভৌগোলিক অবস্থান

জেরুসালেম ৩৪ ডিগ্রী অক্ষাংশ ও ৩১.৫২ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের উত্তরে অবস্থিত। শহরটি একটি পাহাড়ী এলাকা অর্থাৎ অধিত্যকা। এর চারদিকে রয়েছে পাহাড়। উল্লেখযোগ্য পাহাড়গুলো হচ্ছে :[৪]

১. মোরিয়া পাহাড় : এই পাহাড়ের উপরই মসজিদে সাখরা ও মসজিদে আকসা অবস্থিত।

২. যাইতুন পাহাড় : এর অপর নাম হচ্ছে তূর পাহাড়। এটি শহরের পূর্বদিকে সাগরের স্তর থেকে ৮২৬ মিটার উপরে অবস্থিত। হারামে কুদ্সের দেয়ালের পার্শ্বে দাঁড়ালে এই পাহাড়ের পাথরগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। হারাম শরীফ ও পাহাড়ের মাঝখানে আছে 'কাদরুন' উপত্যকা। *তালমুদে* এই পাহাড়কে 'মাসেহ' বা 'তাতইজ' পাহাড় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *তালমুদে* আরো বর্ণিত আছে, ইহুদীরা এই পাহাড়ে লাল গাভী জ্বালিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এর ছাই সংগ্রহ করে তা হাইকালে সুলাইমানীতে ছিটিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য কুরআনের তাফসীরকারগণ বলেছেন, গাভী লাল ছিল না বরং গাঢ় হলুদ রংএর ছিল। যাইতুন পাহাড়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, খৃস্টানদের ধারণা অনুযায়ী সেখানকার 'মুআসরাহ' কিংবা 'জাতসমানী' বাগানের কাছে ইয়াসু নামায পড়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ পাহাড়ে একটি গর্ত আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে হযরত ঈসা (আ) কিছু শিক্ষা দান করেছিলেন, তাঁর হাওয়ারীদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং জেরুসালেমের জন্য কেঁদেছিলেন।

৩. সাহ্ইউন পাহাড় : এই পাহাড়ের অপর নাম হচ্ছে দাউদ নবীর পাহাড়। এটি সাগরের স্তর থেকে ৭৭০ মিটার উপরে অবস্থিত।

৪. আকরা পাহাড় : এই পাহাড়ের উপর খৃস্টানদের 'কিয়ামাহ' গীর্জা অবস্থিত।

৫. যাইতা পাহাড় : এটি বাব-আস-সাহেরার নিকটবর্তী একটি পাহাড়।

৬. গাওল পাহাড় : এটি জেরুসালেম শহরের উত্তর দিকে এবং সাগরের স্তর থেকে ৮৩৯ মিটার উপরে অবস্থিত। প্রাচীন যুগে এই পাহাড়ের উপরই কেনানীদের 'হাব্আহ' শহর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

---

৩. আল আকসা ওয়াল কুদ্স; সৌদী আরব, ১৩৯৬ হিঃ।

৪. আত্-তাতাউর আল-উমরানী লি মদীনাতিল কুদ্স-ডঃ আঃ আলীম অবদুর রহমান খোদার, ১৯৮১ খৃঃ।

৭. সামউইল নবীর পাহাড় : এটি শহরের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সাগরের স্তর থেকে এর উচ্চতা হচ্ছে ৮৮৫ মিটার।

এছাড়াও শহরের চারপাশে আরো অনেক পাহাড় আছে। শহরটি সাগরের স্তর থেকে ৭৩৫ মিটার উপরে অবস্থান করছে। পাহাড়ী এলাকার কারণে তা কোন প্রধান বাণিজ্য এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং শহরের মাঝে কোন নদীনালাও নেই। অপরদিকে প্রাকৃতিক কারণে শহর সম্প্রসারণের বেশী সুযোগ নেই।

জেরুসালেম শহর প্রাকৃতিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত। পুরাতন জেরুসালেম ও নতুন জেরুসালেম। ১৯৪৮ সালে নতুন ও পুরাতন জেরুসালেমের মোট আয়তন ছিল ৪১ বর্গকিলোমিটার। শহর সম্প্রসারণের পর বর্তমান আয়তন হচ্ছে, ১১০ বর্গকিলোমিটার। পুরাতন জেরুসালেম শহর ৪ দিক থেকে দেয়ালঘেরা। দেয়ালের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪ কিলোমিটার এবং উচ্চতা হচ্ছে ১২ মিটার। দেয়ালে মোট ৮টা গেট আছে। বিভিন্ন দিক থেকে লোকেরা এ সকল গেট দিয়ে তাতে প্রবেশ করে। প্রসিদ্ধ গেটগুলো হচ্ছে, উত্তরে বাবুল আ'মুদ, দক্ষিণে বাবুল মাগারিবা, পূর্বে সানস্টিফান ও পশ্চিমে বাবুল খলীল। পূর্বদিকে অবস্থিত বাবুজ্জাহাবী নামক ৮ম গেটটি বন্ধ থাকে। ১৫৩৬ খৃস্টাব্দে উসমানী সুলতান সুলাইমান ৫ বছরব্যাপী ঐ দেয়াল নির্মাণ করেন।

লোকবসতি

১৯৮০ খৃঃ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জেরুসালেমের লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩ লাখ ৯২ হাজার।[৫] ১৯৬৭ খৃঃ থেকে ১৯৮০ খৃঃ পর্যন্ত বর্ধিত জনসংখ্যার ৫৮% ভাগ হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে জেরুসালেমে আগত ইহুদী সম্প্রদায়। জেরুসালেম শহরের বিভিন্ন অংশে ইহুদী বসতি গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেখানে ইয়েমেন, ইথিওপিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ থেকে ইহুদীদেরকে এনে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। ইসরাইল সরকার অধিকৃত ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে ইহুদীদেরকে পুনর্বাসন করছে। যাতে করে ইহুদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শহরের আরব ও ইসলামী বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ইহুদীকরণ করা সম্ভব হয়। ইসরাইল সরকার ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে, জর্দানের শাসন থেকে জেরুসালেম জবরদখল করার পর ২৫শে জুলাই এক আদমশুমারী পরিচালনা করে ও উপস্থিত আরব মুসলমানদেরকে

---

৫. আত্-তাতাউর আল-উমরানী লি মদীনাতিল কুদ্স; ডঃ আবদুল আলীম আব্দুর রহমান খোদার-প্রকাশ-১৯৮১ খৃঃ (৬) ঐ।

ইসরাইলী পরিচয়পত্র গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। এতে করে যুদ্ধের ফলে পালিয়ে যাওয়া ১ লাখ ২০ হাজার ফিলিস্তিনীকে অনুপস্থিত ধরে তাদের নাগারিকত্ব বাতিল করে সেই স্থানে ইহুদীদের পুনর্বাসন করে। বর্তমান সময়ে (১৯৯১ খৃঃ) পুনর্বাসনের ফলে ইহুদী জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে জেরুসালেমে ইহুদীদের সংখ্যা হচ্ছে ৪ লাখ। ১৯৯২ সালে জেরুসালেমের লোকসংখ্যা হচ্ছে, ৫ লাখ ৫৫ হাজার।[৬] এর মধ্যে পূর্ব জেরুসালেমে বাস করছে ১ লাখ ৪০ হাজার ইহুদী। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের সংখ্যা ১ লাখ ৫৫ হাজার। ১৯৯৩ সালে ৫৫ হাজার আবাসিক ইউনিট নির্মান শেষ হয়েছে। এতে করে মুসলমানদের চাইতে ইহুদীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে।

আবহাওয়া

জেরুসালেমের গড় তাপমাত্রা মাঝারি ধরনের। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতু বাদ দিলে, অন্যান্য সময়ের তাপমাত্রা গড়ে ১৮ সেন্টিগ্রেড। সেখানকার ফসল, গাছপালা ও কৃষি ভূমধ্যসাগরের আবহাওয়ার আর্দ্রতা ভোগ করে। জানুয়ারী মাসে সর্বাধিক ঠাণ্ডা থাকে। তখন তাপমাত্রা থাকে ৯.৭ সেন্টিগ্রেড। পক্ষান্তরে আগস্ট মাসে সর্বাধিক গরম থাকে, তখন তাপমাত্রা থাকে ২৫ সেন্টিগ্রেড। তবে শীতকালে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ৪ সেন্টিগ্রেড।[৭]

জেরুসালেমের গোড়ার কথা

মসজিদে আকসা সম্পর্কে জানতে হলে, আগে জেরুসালেম সম্পর্কে জানতে হবে। খৃস্টপূর্ব ৩ হাজার সালে আরবের ইয়াবুসী গোত্রের শাসক মালিক সাদেক জেরুসালেম শহর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেন এবং শহরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। এটাই তাদের দেশের প্রধান কেন্দ্র ও রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইয়াবুসী গোত্রের লোকদেরকে কেনানী আরবও বলা হয়। ইয়াবুসী সম্প্রদায়ের লোকেরা শহরে বহু বাড়ী-ঘর নির্মাণ করে। তারা 'সাহ্ইউন' পাহাড়ের উপর শহরের প্রতিরক্ষার জন্য একটি দুর্গ তৈরি করে। দুর্গটি প্রধানত হিব্রু ও মিসরীয়সহ অন্যান্য অত্যাচারী এবং লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে নিজেদেরকে

---

৬. Deliberate deceptions facing the facts about the U.S.-Israel relationship, Paul Pandly, U. S.

৭. আত্ তাতাউর আল উমরানী লি মাদীনাতিল কুদ্স, ডঃ আবদুল আলীম আবদুর রহমান খোদার, ১৯৮১ খৃঃ।

রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়। তারা ১৫৫০ খৃস্টপূর্ব সালে হিব্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মিসরের প্রথম ফেরআউন তাহতামেসের সাথে মৈত্রীচুক্তি করে। প্রায় ২ হাজার বছর পর্যন্ত তাদের হাতে শহরের নিয়ন্ত্রণ থাকে। খৃস্টপূর্ব ১১ সাল পর্যন্ত তারা শহরের উপর কর্তৃত্ব করে।

হযরত মূসা (আ) এর ইন্তিকালের পর বনি ইসরাইল হযরত ইউশা বিন নূনের নেতৃত্বে জেরুসালেমে প্রবেশ করে। ৩২২ খৃস্টপূর্ব সালে আলেকজান্ডার মাকদুনীর হাতে পরাজয় বরণ করার পর জেরুসালেমে বনি ইসরাইলের কর্তৃত্বের অবসান হয়।

যাই হোক, ইয়াবুসী শাসনামলে জেরুসালেমসহ সিরিয়া ও ইরাকব্যাপী যে সভ্যতা বিরাজ করে তাকে আবিলা সভ্যতা বলা হয়। বিজ্ঞানীরা মাটি খনন করে সেই যুগের বহু আরবী লেখার নিদর্শন উদ্ধার করেন। ১৯২৯-৩১ খৃঃ, ফরাসী বিজ্ঞানীরা 'রাস-শামরা' নামক স্থানে খনন করে আরবী লেখা সমৃদ্ধ আবিলা সংস্কৃতির বহু পাথর উদ্ধার করেছেন।

ইয়াবুসীরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী সংস্কৃতি চালু করে। তারা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য রুটি পেশ করত। ঐ আমলে শহরে পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন কূপ থেকে সরু খাল কেটে পানির ঝর্না প্রবাহিত করা হয়।

জেরুসালেম শহরের গুরুত্ব

এই শহরে মসজিদে আকসার মত পবিত্র স্থান রয়েছে। এটি আম্বিয়ায়ে কিরামের অবস্থান ও ইবাদতের স্থান এবং শত-সহস্র আল্লাহ-প্রেমিকের ভ্রমণকেন্দ্র। আসমানের কত অগণিত ফেরেশতা এখানে এসেছেন। এক হাদীস অনুযায়ী এখানেই ময়দানে হাশর ও নশর (উত্থান-বিস্তার) হবে। এই শহরের উপর দিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা) মে'রাজ হয়েছে। মসজিদে আকসার মধ্যে সুলাইমান (আ) এর আসন ও দাউদ (আ) এর মেহরাব রয়েছে। এই শহরে রয়েছে 'আইনে সালওয়ান' বা সালওয়ান পানির নালা। এই নালার পানিকে হাউজে কাউসারের পানির মত মর্যাদাবান মনে করা হয়।[৮] এখানে রয়েছে মেহরাবে মরিয়ম।

জেরুসালেম শহর পৃথিবীর একটি সর্ববৃহৎ পর্যটনকেন্দ্র। এটাকে একটি বহুজাতিক শহরও বলা যায়। মুসলমান, খৃস্টান ও ইহুদীদের ধর্মীয়

---

৮. আল-আকসা ওয়াল-কুদস, আল-ফাতাহ মুক্তি সংস্থার পুস্তিকা।

উপাসনালয়ের কারণে এখানে বহিরাগত বহু পর্যটক ও তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে। হযরত ঈসার জন্মস্থানও এই জেরুসালেম শহরে। এখানে মসজিদে আকসা ব্যতীত আরো ৩৫টি মসজিদ আছে।

মসজিদে আকসার দেয়ালের বাইরে পূর্বদিকে 'বাবুর রাহমাহ' সংলগ্ন রয়েছে দুইটি প্রখ্যাত মুসলিম গোরস্তান। এই গোরস্তানে শায়িত আছেন দুইজন প্রখ্যাত সাহাবী। তাঁরা হলেন, উবাদাহ ইবন সামেত বদরী। তিনি ৬৫৩ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যজন হচ্ছেন, শাদ্দাদ বিন আউস- আনসারী। তিনি ৬৭৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৯]

পবিত্র কুরআনে জেরুসালেম শহরকে বরকতময় ও পবিত্র ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন- الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ

অর্থাৎ, আমরা মসজিদে আকসার আশপাশকে বরকতপূর্ণ করে দিয়েছি। এখানে মসজিদে আকসার 'আশপাশ' বলতে জেরুসালেম শহরকেই বুঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জেরুসালেম শহরের সেই বরকতপূর্ণ জিনিসগুলো কি কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, জেরুসালেম শহরের নদীনালা, মিষ্টি পানি ও ফল-ফলাদি হচ্ছে সেই বরকতময় জিনিস। এছাড়াও যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে যেখানে বহু নবী-রাসূল ও আউলিয়া শায়িত আছেন, তাদের মত নেককার লোকদের জীবন-মৃত্যুর স্থান অবশ্যই বরকতময়।[১০]

অন্য এক আয়াতে ঐ বরকতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেছেন,

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

'আমরা যখন তাদেরকে আদেশ দিলাম, এই জনপদে প্রবেশ কর এবং সেখানকার যেখানে ইচ্ছা সেখানে পর্যাপ্ত খাও'। এই আয়াতে জেরুসালেম শহরে পর্যাপ্ত খাওয়া-পরার নির্দেশ থেকে বুঝা যায়, তা আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতে বরকতপূর্ণ।

মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য ও পানীয় বেশী প্রয়োজন। জেরুসালেম শহরের অনুকূল আবহাওয়া কৃষিকাজের উপযোগী। এছাড়াও পর্যাপ্ত মিষ্টি পানি

---

৯. আল-আকসা ওয়াল কুদস, আল-ফাতাহ মুক্তি সংস্থার পুস্তিকা, ১৩৯৬ হিঃ।

১০. আত-তাতাউর আল-উমরানী লি-মাদীনাতিল কুদস, ডঃ আবদুল আলীম আবদুর রহমান খোদার।

থাকায় খাদ্যসামগ্রীর অভাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। খাদ্য ও পানীয়ের পর্যাপ্ততার জন্য এই শহরটি বরকতময় হয়েছে।

মসজিদে আকসার তাৎপর্য ও ফজীলত

মসজিদে আকসার মোট ৭টি নাম রয়েছে। ১টি হচ্ছে, মসজিদে আকসা। 'আকসা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দূরবর্তী'। মসজিদে আকসার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, দূরবর্তী মসজিদ। মক্কার মসজিদে হারাম থেকে মে'রাজের সূচনা হয়। সেই উপলক্ষে, কুরআনের সূরা ইসরায় 'মসজিদে আকসা' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ মক্কা থেকে এটি দূরে বলে আল্লাহ ঐ মসজিদকে 'দূরবর্তী মসজিদ' বা মসজিদে আকসা বলে অভিহিত করেন। আগে এর নাম ছিল, বাইতুল মাকদিস। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) ইসলামী যুগ থেকে ঐ মসজিদের নামকরণ করা হয় 'মসজিদে আকসা'। এর অন্য নামগুলো হচ্ছে, ৩ আল-কুদস ৪. মসজিদে ইলিয়া ৫. সালাম ৬. উরুশলেম ও ৭. ইয়াবুস।

উলামায়ে কেরাম ও ঐতিহাসিকদের মতে, মে'রাজের সময় মসজিদে আকসার কোন ঘর ছিল না। বরং পরবর্তীতে সেখানে মসজিদে আকসা ও মসজিদে সাখরার ভবন তৈরি হয়। সূরা ইসরার মধ্যে যুগ যুগ ধরে নবীদের পুরাতন এবাদতের উক্ত খালি স্থানকে 'মসজিদে আকসা' বলা হয়েছে। খালি স্থানকে মসজিদ বলার কারণ হল, সেটি ইবাদতের স্থান ছিল।[১১] পরবর্তীতে সেখানে মসজিদে সাখরা ও মসজিদে আকসা নামে ২টি মসজিদ তৈরি হয়। যদিও মসজিদে সাখরা মূলতঃ মসজিদে আকসারই অংশ।

উলামায়ে কেরামের মতে, মসজিদে আকসা বর্তমান মসজিদ ভবন ছাড়াও আরো বিরাট অংশের নাম। বরং ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে বিভিন্ন গেইট বিশিষ্ট বড় দেয়ালের ভেতরের সবটুকু অংশই মসজিদে আকসা।[১২] মসজিদে আকসা মূলতঃ ইবাদতের একটি বিরাট খালি স্থানের নাম। ঐ খালি স্থানের অংশ বিশেষের উপর মসজিদে আকসা ও সাখরা নির্মিত হয়েছে। বাকী অংশটুকু চারদিক থেকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

মসজিদে আকসা পুরাতন জেরুসালেম শহরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত।

---

১১. আত্ তাতাউর আল-উমরানী লি মাদীনাতিল কুদ্স, ডঃ আবদুল আলীম আবদুর রহমান খোদার।

১২. কাবলা আনইউ হাদ্দাসা আল-আকসা-আবদুল আযীয মোস্তফা, সৌদী আরব, প্রকাশ-১৯৯০ খৃঃ

মসজিদে আকসার কারণেই মূলতঃ জেরুসালেম শহরের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ নবী সেখানে ইবাদাত করেছেন। এখান থেকেই মিরাজ সংঘটিত হয়েছে এবং মিরাজেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। এ প্রসংঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেছেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ ঃ 'সেই সত্তার জন্য পবিত্রতা যিনি তাঁর বান্দাহকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকাসায় রাতে সফর করিয়েছেন। মসজিদে আকসার আশেপাশে আমরা বরকত নাযিল করেছি। যেন আমরা তাঁকে আমাদের নিদর্শন দেখতে পারি। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বাধিক শ্রোতা ও দ্রষ্টা।' (সূরা আল ইসরা : ১)

এ আয়াতে আল্লাহ মসজিদে হারামের পর মসজিদে আকসার কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে যে দু'টি মসজিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে মসজিদে আকসা ১টি। মসজিদে আকসা ২টি বড় ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ১টা হচ্ছে, (إسراء) অর্থাৎ রাতের সফর তথা যমীনের ভ্রমন। আর ২য় টা হচ্ছে, মিরাজের আসমানী সফর। মসজিদে আকসা যেমন যমীনের সফরের শেষ কেন্দ্র, একই সময়ে তা আসমানী সফরেরও সূচনা কেন্দ্র। অনুরূপভাবে তা মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন ও মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রার কেন্দ্রও বটে।

মসজিদে আকসা মুসলমানদের কাছে গত ১৪শ' বছর যাবত দুই কিবলার প্রথম কিবলা হিসেবে বিবেচিত।

মসজিদে আকসা সেই তিন মসজিদের একটি, যেগুলোতে ইবাদাত ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করার অনুমতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدُ الرَّسُوْلِ وَمَسْجِدُ الاَقْصَى.

অর্থ ঃ 'তিন মসজিদ ব্যতীত সাওয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোন মসজিদে সফর করা যাবে না। তিন মসজিদ হচ্ছে, মসজিদে হারাম, মসজিদে নবওয়ী ও মসজিদে আকসা।' (বুখারী ও মুসলিম)

দীর্ঘ ১৭ মাস যাবত মুসলমানগণ প্রথম কিবলাহ বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এই কথার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ (সূরা আল বাকারা)

অর্থ ঃ "হে নবী ! আপনি যে কিবলার উপর ছিলেন, তা এই জন্য পরিবর্তন করা হল (অর্থাৎ বাইতুল মাকদিস থেকে কা'বার দিকে) যেন আমরা জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে সেই সমস্ত লোকদের মাঝ থেকে, যারা নিজেদের উপর ভর করে পেছন দিকে সরে যায়। আল্লাহ যাদেরকে হোদায়েত দিয়েছেন এটা তাদের জন্য মোটেই কোন বড় বিষয় নয়। আল্লাহ আপনাদের নামায বরবাদ করবেন না। আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।"

মসজিদে আকসার নামায অন্যান্য মসজিদের নামাযের চাইতে ৫শ' গুণ উত্তম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস রয়েছে। তিবরানী আবুদ্ দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মসজিদে হারামের নামাযে
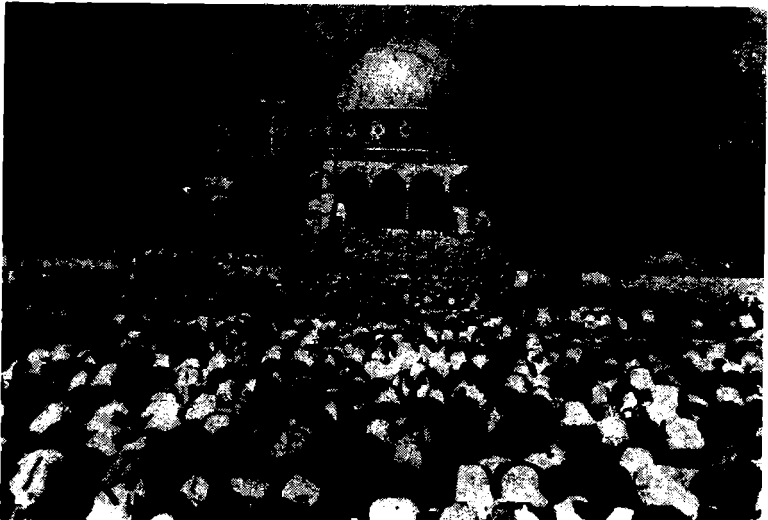
আল আকসা মসজিদে নামাজের জামাত

১ লাখ গুণ, আমার মসজিদে ১ হাজার গুণ, ও বায়তুল মাকদিসে ৫শ' গুণ সওয়াব হয়।'

ইবনে খোযায়মাহ এবং বাজ্জারও এই একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ্ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'ঘরে নামায পড়লে এক গুণ, মসজিদে পড়লে ২৫ গুণ, জামে মসজিদে পড়লে ৫শ' গুণ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নবওয়ীতে ৫০ হাজার গুণ এবং মসজিদে হারামে পড়লে এক লাখ গুণ সওয়াব পাওয়া যাবে।'

মসজিদে আকসায় অন্যান্য ইবাদতেরও একই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। তাতে কুরআন শরীফ খতম করা, রোযা রাখা, ইতেকাফ করা ও ইলম অর্জন করা মোস্তাহাব। এমন কি ইবাদতের উদ্দেশ্যে সেখানে মসজিদের প্রতিবেশী হওয়াও উত্তম।[১৩]

বর্ণিত আছে, মসজিদে আকসায় গুনাহও অন্য জায়গার গুনাহর চাইতে বহুগুণ বেশী। কেননা, সম্মানজনক সময় ও স্থানের গুনাহ আল্লাহর প্রতি কম ভয় ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'বেহেশত বাইতুল মাকদিসের দিকে ঝুঁকে আছে। বাইতুল মাকদিসের সাখরাহ জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে এসেছে এবং তা যমীনের জন্য কলসীস্বরূপ।'[১৪] সাখরা অর্থ পাথর। এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইবনে ফারেস বলেছেন, আল্লাহর নবীগণ বাইতুল মাকদিস নির্মাণ ও আবাদ করেছেন। এতে এক বিঘত জায়গাও এমন নেই, যেখানে নবীরা নামায পড়েননি কিংবা ফেরেশতারা অবস্থান করেননি।

রাসূলুল্লাহর (সা) দাসী মাইমুনাহ বর্ণনা করে, 'আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল! বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন! তখন তিনি বলেন, এটি হচ্ছে হাশর ও নশরের স্থান; তোমরা সেখানে গিয়ে নামায পড়। সেখানকার নামাযে ১ হাজার গুণ সওয়াব রয়েছে।' (ইবনে মাজাহ) আবু দাউদ শরীফে আরো একটু বেশী বর্ণিত আছে। মাইমুনাহ জিজ্ঞেস করেন, আমি যদি সেখানে যেতে না পারি? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, 'তুমি সেই মসজিদের বাতির জন্য তেল পাঠিয়ে দিলেই সেখানে যাওয়ার সওয়াব পাবে।'

---

১৩. আত্-তাতাউর আল-উমরানী লি মাদীনাতিল কুদ্স, ডঃ আবদুল আলীম আবদুর রহমান খোদার।

১৪. আ'লামুল মাসাজিদ, যারাকসী, ২৮৬ পৃঃ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একই বছর হজ্জ করে এবং মসজিদে নবওয়ী ও মসজিদে আকসায় নামায পড়ে, সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।'[১৫]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'কেউ যদি বেহেশতের কোন অংশ দেখতে চায়, সে যেন বাইতুল মাকদিসের দিকে তাকায়।'[১৬]

হিজরাতের এক বছর কয়েক মাস আগে ২৭শে রজব, রাসূলুল্লাহর (সা) ঐতিহাসিক মিরাজ বা আসমানী সফর অনুষ্ঠিত হয়। সেই মিরাজের প্রতি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপন করে হযরত আবু বকর (রা) 'সিদ্দিক' উপাধি লাভ করেন। মিরাজের প্রতি বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গবিশেষ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তিনি (নবী) জিবরীল (আ)-কে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেছেন। সেখানে রয়েছে জান্নতুল মাওয়া। যখন সিদরাহকে ঢেকে রেখেছিল সেই জিনিস, যা তাকে ঢেকে রাখে। (নবীর) চোখ ভুল দেখেনি এবং আদেশ অমান্য করেনি। তিনি তাঁর রবের বিরাট নিদর্শন দেখতে পেয়েছেন। (সূরা নাজম : ১৩-১৮)

সেই ঐতিহাসিক মিরাজ উপলক্ষে রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে ফেরেশতারা মসজিদে আকসায় সমবেত হয়েছিলেন। সেখানেই তিনি আম্বিয়ায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে নামায পড়েন ও নিজে নামাযের নেতৃত্ব দেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ বুঝিয়ে দেন যে, ইমাম ও ইমামতির কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে তা মক্কায় স্থানান্তরিত হয়ে গেছে।

বাইতুল মাকদিসের হিফাজত বিরাট ইসলামী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে সেই দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে তাকিদ দিয়ে বলেছেন, হে মুআজ! আল্লাহ আমার পরে তোমাকে সিরিয়ার উপর বিজয় দান করবেন। মিসরের আরীস থেকে ইরাকের ফোরাত পর্যন্ত তোমরা বিজয় লাভ করবে। তাদের নারী ও পুরুষেরা কিয়ামাত পর্যন্ত এই ভূমির হেফাজতে নিয়োজিত থাকবে। তোমাদের কেউ যদি সিরিয়া উপকূল কিংবা বাইতুল মাকদিসকে বসবাসের জন্য নির্বাচন করে, সে কিয়ামাত পর্যন্ত জিহাদের মধ্যে নিয়োজিত বলে পরিগণিত হবে।[১৭]

---

১৫. আ'লামূল মাসাজিদ, যারাকসী।
১৬. আ'লামূল মাসাজিদ, যারাকসী, পৃঃ ২১১।
১৭. আস্-সীরাতুন নাবাওইয়াহ আবদুল হামীদ, দারে মিসর লিত্-তাবাআহ্।

বাইতুল মাকদিস প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর একটি স্ট্রাটেজিক বা কৌশলগত স্থান। এই কারণে তিনি মে'রাজের ঘটনার মাধ্যমে তাকে ইসলামের অধীন করে দিয়েছেন।

অনেকে মসজিদে আকসাকে মক্কা ও মদীনার দুই হারাম শরীফের মত ৩য় হারাম শরীফ হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, মসজিদে আকসা 'হারাম শরীফ' নয়। (ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, পৃঃ ৪৩৪) অনুরূপভাবে, শেখ আবু বকর আবু যায়েদ ও তাঁর 'মু'জাম আল-মানাহী আল্লাফজিয়া' গ্রন্থে এবং শেখ মোহাম্মদ সালেহ ওসাইমিন তাঁর *'ফারায়েদুল ফাওয়ায়েদ'* গ্রন্থে একই কথা বলেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে, জেরুসালেমের হারাম শরীফ কিংবা আল-খলীল শহরের মসজিদে ইবরাহীমকে 'হারামে ইবরাহীমি' বলা ঠিক নয়। তাঁর মতে, বাইতুল মাকদিসে 'হারাম' শরীফ নামে কোন স্থান নেই। (আল-ফাতাওয়া আল-কোবরা, ২৭ খণ্ড, পৃঃ ১৪)

মসজিদে আকসার বর্ণনা

পরিবেষ্টিত এলাকার দক্ষিণাংশে মসজিদে আকসার বর্তমান ভবন অবস্থিত। মসজিদে সাখরা, মসজিদে আকসা এবং অন্যান্য সেবা ভবনসহ চার দেয়ালের

আল আকসা মসজিদের সম্মুখভাগ

ভেতরের মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে ১ লাখ ৪০ হাজার ৯শ' বর্গমিটার। মসজিদে আকসা মসজিদে সাখরা থেকে ৫শ' মিটার দক্ষিণে অবিস্থত। একই সীমানার ভেতর আরো রয়েছে মসজিদে উমার ও জামে নিসা।

পশ্চিম দেয়াল থেকে মসজিদে আকসার উত্তর-পশ্চিম কোণের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৭০ মিটার। মসজিদের সীমানার দেয়াল থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মসজিদে আকসার দূরত্ব সমান। মসজিদের উত্তর থেকে দক্ষিণে একটি সরল রেখা টানলে পূর্ব ও পশ্চিমে ২৮৫ মিটার সমান দূরত্ব পাওয়া যায়। উত্তর দিক থেকে মসজিদে প্রবেশ করলে সামনে একটি বিরাট বারান্দা পড়ে। সেখান থেকে মসজিদের ৭টি দরজায় যাওয়ার পথ আছে। এই ৭টি দরজা ছাড়াও মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে আরো ২টি দরজা আছে। মসজিদের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে রয়েছে মহিলাদের পৃথক প্রবেশ পথ। মসজিদে আকসার পূর্ব দিকে 'জামে উমার' নামে আরেকটি মসজিদ আছে। জেরুসালেম বিজয়ের সময় হযরত উমার (রা) সেখানে যে মসজিদ তৈরি করেছিলেন বর্তমান মসজিদ তারই অবশিষ্টাংশ।

মসজিদে অনেকগুলো স্তম্ভ আছে। এগুলোতে খুবই সুন্দর নকশা অংকন করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে সুন্দর ও মনোরম নকশা খচিত মেহরাবে যাকারিয়া।

মসজিদে আকসায় অনেকগুলো গম্বুজ আছে। সেগুলো হচ্ছে, ১. সিলসিলাহ গম্বুজ ২. সুলাইমান গম্বুজ ৩. নাহওইয়া গম্বুজ ৪. শেখ খলীল ৫. খিদির গম্বুজ ৬. মেরাজ গম্বুজ ৭. মূসা গম্বুজ ৮. ইউসূফ গম্বুজ ও ৯. মেহরাবুন্নবী গম্বুজ।

মসজিদে কয়েকটি মিনারা আছে। সেগুলো হচ্ছে ১. বাবুল আসবাত মিনারা ২. বাবুল মাগারেবা মিনারা বা বাবুল গাওয়ানিমা মিনারা এবং ৩. বাবুস্ সিলসিলাহ মিনারা।

মসজিদে আকসায় অজু ও পানি পান করার কয়েকটা জায়গা আছে। সেগুলোর মধ্যে সাবিল কায়েতবায়, সাবিল কাসেম পাশা, সাবিল বুদাইরী, সাবিল শালান এবং সাবিল বাবুল হাব্‌স অন্যতম।

মসজিদে আকসার দক্ষিণ দেয়াল খুবই মজবুত। ফলে মসজিদে আকসায় ইসরাইলীদের প্রসিদ্ধ অগ্নিকাণ্ডে এ দেয়ালের কোন ক্ষতি হয়নি। মসজিদে আকসার ১১টা দরজা আছে। সেগুলো হচ্ছে উত্তরদিকে ৭টি, পূর্বদিকে ১টি,

পশ্চিমে ২টি এবং দক্ষিণে ১টি দরজা।[১৮] সেগুলোর নাম হলো : ১. বাবুল আসবাত ২. বাবুল মাগারেবা ৩. বাবুল গাওয়ানিমা ৪. বাবুস সিলসিলা ৫. বাবুল হাবস ৬. বাবুন নাযির ৭. বাবুল কাত্তান ৮. বাবে হিত্তাহ ও ৯. বাবে শারফিল আম্বিয়া বা বাবে ফয়সল ইত্যাদি। দক্ষিণ দিকে জামে আন্ নিসা নামে মহিলাদের জন্য একটি মসজিদ আছে।

উমাইয়া খলীফাহ আবদুল মালেক বিন মারওয়ান প্রথমে মসজিদে সাখরার সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি মসজিদে আকসার নির্মাণ কাজ শুরু করলেও তা শেষ করতে পারেননি। ৭২ হিঃ মোতাবেক ৬৯০ খৃঃ তাঁর ছেলে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেক মসজিদে আকসা নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন।

মসজিদে আকসার দৈর্ঘ্য ৮০ মিটার ও প্রস্থ ৫৫ মিটার। এতে মারবেল পাথরের তৈরি মোট ৫৩টি স্তম্ভ আছে এবং পাথরের তৈরি ৪৯টি বর্গাকৃতির খুঁটি আছে। স্তম্ভ ও খুঁটিগুলোর উচ্চতা হচ্ছে ৫ মিটার। এগুলোর উপর ৯ মিটার চওড়া পাথরের ধনুক নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর উপর নির্মিত হয়েছে ছাদ। স্তম্ভগুলোকে তামার তৈরি পাত দ্বারা মোড়ানো হয়েছে। মসজিদের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে বিরাট গম্বুজ। শিশা দ্বারা গম্বুজের চারদিক ঢালাই করা হয়েছে। মসজিদের সামনের গম্বুজটি ১৭ মিটার উঁচু ও তাতে মোজাইক করা হয়েছে। এতে বহু কারুকার্য করা হয়েছে।

মসজিদে কিবলার দিকে মিম্বার নূরুদ্দিন ও মেহরাব সালাহউদ্দিন অবস্থিত। মসজিদে একটা বড় মেহরাব আছে যা মিম্বার থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত। এর নামকরণ করা হয়েছে মেহরাবে দাউদ। তারপর লোকেরা এর নামকরণ করেছে মেহরাবে উমার। মসজিদের শুরুতে মিম্বার থেকে পশ্চিমে আরেকটি মেহবার আছে। একে মেহরাবে মুআওইয়াহ বলা হয়।

মসজিদে আকসার ভবন পূর্ব সীমানার দেয়াল পর্যন্ত পৌছেনি। কেননা, হযরত উমার (রা) লোকদেরকে পশ্চিম সীমানায় মসজিদ ভবন নির্মাণের নির্দেশ দেয়ায় তখন থেকে পূর্বাংশ খালি পড়ে আছে।

মসজিদে আকসার সীমানার ভেতর কয়েকটি মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে। সেগুলো হল, মাদ্রাসা নাহওইয়া, মাদ্রাসা নাসরিয়া ও মাদ্রাসা ফারেসিয়া। মসজিদে আকসা ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এতে তাফসীর,

---

১৮. রেসালাতুল মাসজিদ ফিল ইসলাম, ডঃ আবদুল আযীয মুহাম্মদ আল লোমাইলাম, প্রকাশকাল ১৯৭৮, রিয়াদ, সৌদী আরব।

হাদীস, ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দান করা হয়।

অনেক দিন পর্যন্ত মসজিদে আকসায় ৪ মাজহাবের ৪ জন ইমামের মাধ্যমে নামাযের ব্যবস্থা আঞ্জাম দেয়া হতো। এর ফলে তা বিরাট ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে মাজহাব-ভিত্তিক ইমামতির পদ্ধতি বাতিল করা হয়। মসজিদে আকসার চারপাশে অনেকগুলো 'গরীব বোর্ডিং' আছে। যেয়ারতকারী গরীব মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তি বা সংস্থা তা কায়েম করেছেন।

মসজিদে আকসার পশ্চিম দেয়ালকে 'বোরাক শরীফ' বলা হয়। এতে রাসূলুল্লাহর (সা) বোরাক বাঁধা হয়েছিল। ইহুদীরা এটাকে 'আল-হায়েত আল-মাবকী' বলে। এই দেয়ালটি বিরাট পাথর দ্বারা নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১৫৬ ফুট এবং উচ্চতা ৬৫ ফুট। ইহুদীদের দাবী হচ্ছে, এটি হাইকালে সুলাইমানীর অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বর্তমানে তা মসজিদের আঙিনার অংশ ও মসজিদের ওয়াকফ বিভাগের মালিকানাধীন।

মসজিদে আকসার দরজাগুলোতে অতি বেশী নকশা ও সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে। ১৯২২ খৃঃ মসজিদে আকসা সংস্কার সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ফিলিস্তিনী কমিটি মসজিদের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের জন্য মিসর ও তুরস্কের প্রকৌশলীদেরকে আহ্বান করে। কমিটি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখে, মসজিদের বিভিন্ন খুঁটি ও স্তম্ভগুলোতে ফাটল ধরেছে এবং এগুলোর পক্ষে আর মসজিদের ছাদ বহন করা সম্ভব নয়। তারা মসজিদের নকশা ও ডিজাইন বহাল রেখে মেরামতের কাজ শেষ করেন। ১৯২৭ খৃঃ মোতাবেক ১৩৪৬ হিঃ মসজিদে আকসার গম্বুজ সংস্কার করা হয়। একই বছর ভূমিকম্পে মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফাটল ধরে। ১৯৩৮ খৃঃ উক্ত ফাটল মেরামত করা হয়। বিভিন্ন সংস্কারের সময় মসজিদে আকসার নকশা ও কারুকার্য অক্ষুণ্ন রাখা হয়। এটি পৃথিবীর একটি সুন্দর স্থাপত্য কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত।

মসজিদে সাখরা

উমাইয়া খলীফাহ আবদুল মালেক বিন মারওয়ান ৭০ হিরজী মোতাবেক ৬৯১ খৃঃ মসজিদে সাখরা নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত যে, ভূপৃষ্ঠে এটিই হচ্ছে সবচাইতে বেশী সুন্দর ইমারত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট ও সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শন। 'সাখরা' শব্দের অর্থ হচ্ছে পাথর। এই পাথরের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম এই পাথরের কাছে নামায পড়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এর কাছে নিজ ইবাদতগাহ নির্মাণ করেছেন। এই পাথরের উপর আগুনের স্তম্ভ দেখে হযরত ইয়াকুব (আ) সেখানে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। হযরত ইউশা (আ) এর উপর একটা গম্বুজ নির্মাণ করেন। তাকে 'কুববাতুজ জামান' বলা হয়। হযরত মূসা (আ) তীহ্ ময়দানে ওহী লাভের উদ্দেশ্যে বৈঠকের জন্য যে তাঁবু নির্মাণ করেছিলেন, পরবর্তীতে তাকে এই পাথরের কাছে স্থাপন করা হয়। এটাই সেই পাথর, যার কাছে হযরত দাউদ (আ) নিজ মেহরাব তৈরি করেছিলেন এবং এর কাছেই হযরত সুলাইমান (আ) প্রসিদ্ধ ইবাদতগাহ 'হাইকালে সুলাইমানী' নির্মাণ করেছিলেন। এটাই সেই পাথর, যার উপর থেকে নবী করীম (সা) মে'রাজের রাত্রে আসমানে উঠেছিলেন।

সাখরা মসজিদ

এই পাথরের উপর মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হল, এটাকে রোদ-বৃষ্টি সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিস থেকে হেফাজত করা। সেজন্য এর উপর মজবুত ইমারত তৈরি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

صَلَّيْتُ لَيْلَةً أُسْرِى بِىْ اِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَمِيْنَ الصَّخْرَةِ

অর্থ ঃ 'আমি মে'রাজের রাতে বাইতুল মাকদিসে পাথরটির ডানে নামায পড়েছি।' আরেক হাদীসে এসেছে ঃ

صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ صُخُوْرِ الْجَنَّةِ

অর্থ ঃ 'বাইতুল মাকদিসের পাথরটি বেহেশতের পাথর।'

মসজিদে সাখরার ইমারতটি ৮ কোণ বিশিষ্ট। এক কোণ থেকে আরেক কোণের দৈর্ঘ্য গড়ে ২০.৫৯ মিটার। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে যথাক্রমে ২০.৬৯, ২০.৪২, ২০.৭৪, ২০.৬০, ২০.৯৬, ২০.৩৩, ২০.৭৪ ও ২০.৭২ মিটার এবং উচ্চতা হচ্ছে ৯.৫ মিটার। প্রত্যেক দেয়ালের
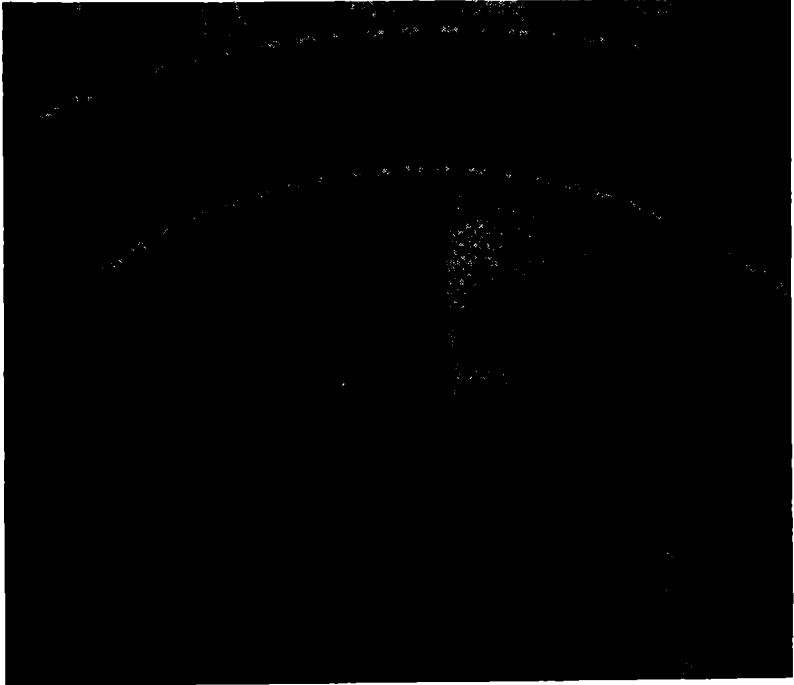
সাখরা বা পাথর। মে'রাজে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওপর বসেছিলেন।

উপরিভাগে জানালা রয়েছে। জানালার সংখ্যা ৫৬। এর মধ্যে ৪০টা জানালা দিয়ে ভেতরে আলো প্রবেশ করতে পারে। দেয়ালের বাইরের অংশে যে মোজাইক ছিল ১৫৪৫ খৃঃ তুর্কী সুলতান সুলাইমান কানুনী তা টাইলস দ্বারা পরিবর্তন করেন। ভেতর থেকে মসজিদের দেয়ালের উচ্চতা ৪ মিটার এবং দেয়ালের সকল অংশে মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে।
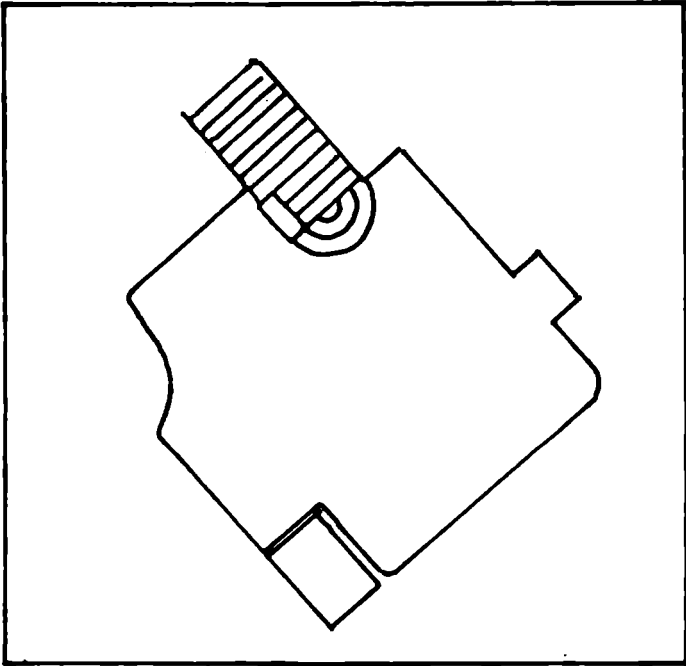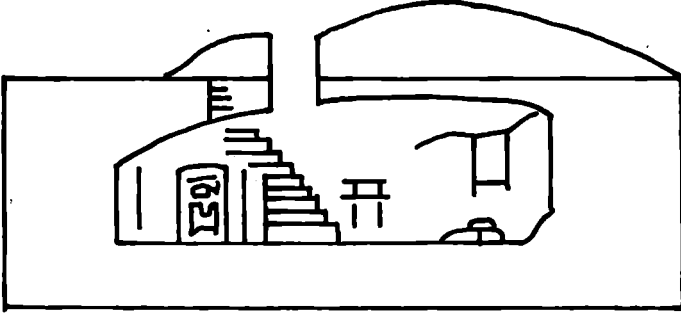
পাথরের নীচের গুহার চিত্র।

মসজিদে রয়েছে একটি বড় ও সুন্দর গোলাকৃতির গম্বুজ। মাটি থেকে ৭ গজ উঁচুতে নির্মিত গম্বুজের উচ্চতা হচ্ছে ১০৫ ফুট ও আয়তন ২০.৪৪ মিটার। গম্বুজে কাঠের তৈরি ২টা স্তর আছে। বাইরের স্তরটি শিশার পাতের তৈরি এবং তা বাইরে থেকে দেখা যায়। ভেতরের স্তরটি মসজিদের ভেতর থেকে দেখা যায়। তাতে সোনা মিশ্রিত পানি দিয়ে কুফী অক্ষরে নীল ভিটির উপর বিভিন্ন আয়াত লেখা আছে।

এই মসজিদে বর্তমানে জামাত সহকারে নামায হয় না। পৃথকভাবে লোকেরা তাতে নামায পড়ে। শুধু মসজিদে আকসাতেই জামাতে নামায হয়। পাথরটি গম্বুজের মাঝামাঝি অবস্থিত। উত্তর থেকে দক্ষিণে পাথরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১৭.৭০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে এর প্রশস্ততা হচ্ছে ১৩.৫০ মিটার। মাটি থেকে এর উচ্চতা হচ্ছে ১-২ মিটার। পাথরের চারপাশে রয়েছে নকশা করা কাঠের রেলিং। উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাথরের হেফাজত করা।

পাথরের নীচে রয়েছে একটা গুহা। গুহার উপরে পাথরটিকে আসমান ও যমীনের শূন্যস্থানে ঝুলন্ত বলে মনে হয়। ভেতরের গুহাটি প্রায় ৪ সমকোণ বিশিষ্ট চতুর্ভূজ আয়তাকার, যার আয়তন হচ্ছে ৭×৫ মিটার সামনের দিকে থেকে নীচে যাওয়ার জন্য তাতে সিঁড়ির ১৪টি স্তর আছে। নীচের ৩টি সিঁড়িকে সেমি গোলাকার মনে হয়। পক্ষান্তরে, পাথরের ছাদের উচ্চতা হচ্ছে ৩ মিটার এবং ছাদে রয়েছে ৭০ × ৮০ সেন্টিমিটার বিশিষ্ট একটি ছিদ্র। সিঁড়ির বাঁয়ে গর্তের বাম কোণকে 'রোকনে দাউদ' এবং উল্টো দিকের অর্থাৎ বিপরীত কোণকে বলা হয় 'রোকনে ইলিয়াস'। সিঁড়ির সাথে লাগা কোণের বিপরীতে মাটির স্তর থেকে সমান্য উঁচু এক স্তর বিশিষ্ট মিম্বারকে বলা হয় 'রোকনে ইবরাহীম'। রোকনে ইবরাহীমের মিম্বারের সামনেই হল ঐ স্তরটি। নীচে যাওয়ার সিঁড়ির ডানে ৪ সমকোণ বিশিষ্ট আয়তাকারের একটি মেহরাব আছে। এটাকে 'মেহরাবে সুলাইমান' বলা হয়। অনুরূভাবে, ভেতরে আরেকটি মেহরাবকে মেহরাবে খিদির'ও বলা হয়।

প্রাক-ইসলাম যুগে, লোকেরা পাথরের উপরের ছিদ্র দিয়ে গুহার ভেতর কোরবানীর রক্ত প্রবাহিত করত। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, মসজিদে সাখরার জন্য খলীফা আবদুল মালেক মিসরের ৭ বছরের যে খাজনার আয়

বরাদ্দ করেছিলেন, সেখান থেকে ১ লাখ দীনার উদ্বৃত্ত থেকে যায়। পরে আবদুল মালেক ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ মসজিদে সাখরার তদারককারী ২জন প্রকৌশলীকে দিতে চান। তারা হলেন, ফিলিস্তিনের রাজা হায়াত কানদী এবং জেরুসালেমের ইয়াযিদ বিন সালাম। কিন্তু তারা ঐ অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমাদের সম্পদ থেকেই এই মসজিদ নির্মাণ করা উচিত। তখন আবদুল মালেক এই অর্থ দিয়ে সোনা কিনে তা মসজিদের গম্বুজ ও দরজায় লাগিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) মে'রাজ

মে'রাজ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সবচাইতে বড় ঘটনা। মে'রাজ তাঁর মক্কী জীবনে সংঘটিত হয়। এখন আমরা এ সম্পর্কে 'The Prophet's Meraj : Travel Notes' এর সাহায্যে বিস্তারিত আলোচনা করবো।[১৯]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের ১ বছর আগে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছে। তবে তা ২৭শে রজব রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়। (যদিও তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম মতপার্থক্য আছে।) কুরআন এবং হাদীসে এই মে'রাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন আমাদেরকে বলে, কেন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বেহেশত-দোজখ দেখানো হয়েছে এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে কি আদেশ-নিষেধ লাভ করেছেন। হাদীস পাঠে জানা যায় কিভাবে উক্ত সফর করানো হয়েছে।

মোট ২৮ জন সাহাবায়ে কেরাম মে'রাজ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে তখন মক্কায় ছিলেন ৭ জন সাহাবী এবং অবশিষ্টরা পরে রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে তা শুনেছেন। বিভিন্ন বর্ণনায় সফরের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। সবগুলো বর্ণনাকে একসাথে করলে আমরা মে'রাজের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি।

রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ ১২ বছর পর্যন্ত মক্কায় আল্লাহর ওহী লাভ করছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৫২ বছর। তিনি কা'বা শরীফের পাশে ঘুমিয়েছিলেন। জিবরীল (আ) হঠাৎ তাঁকে জাগান। আধাজাগ্রত অবস্থায় তাঁকে যমযম কূপের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবরীল তাঁর বুক চিরে ভেতরের অংশ যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস ও দূরদর্শিতা দিয়ে তা পুনরায় বুকে ভেতর স্থাপন করেন। তারপর তাঁর কাছে একটি পশু আনা হয় যার রং সাদা এবং উচ্চতা খচ্চরের চাইতে একটু ছোট। এটি আলোর গতিসম্পন্ন ছিল বলে এর 'বোরাক' নামকরণ করা হয়। বোরাক শব্দের অর্থ 'আলোর গতিসম্পন্ন'। নবী যখন বোরাকের উপর আরোহণ করতে গেলেন, তখন তা নিজেকে সংকুচিত করার চেষ্টা করে তাঁকে সওয়ার হতে বাধা দেয়। কিন্তু পরে জিবরীল (আ) বোরাককে কষে ধরে বলেন, 'সাবধান! ইতিপূর্বে মুহাম্মাদের চাইতে কোন শ্রেষ্ঠ

---

১৯. By Sayyid Abul A'la Maudoodi, Radio Speeches, Islamic Publication, Lahore, p.62-71.

মানুষ তোমার উপর আরোহণ করেনি।' নবী (সা) তাতে আরোহণ করেন এবং জিবরীলের সাথে একসঙ্গে সফর শুরু করেন।

মদীনায় তাঁরা প্রথম যাত্রাবিরতি করেন এবং নামায পড়েন। জিবরীল বলেন, এটা তাঁর হিজরাতের স্থান। মক্কা ত্যাগ করে পরে তাঁকে মদীনায় আসতে হবে। ২য় বার যাত্রাবিরতি করেন সিনাই পাহাড়ে। মূসা (আ) আল্লাহর সাথে এই পাহাড়ে কথা বলেছেন। ৩য় বার যাত্রাবিরতি করেন হযরত ঈসার জন্মস্থান বেথেলহেমে। এটি পশ্চিম জেরুসালেমে অবস্থিত। ৪র্থ বার যাত্রাবিরতি করেন বাইতুল মাকদিস বা পূর্ব জেরুসালেমে। এখানেই বোরাকের সফরের ইতি হয়।

সফরকালে একজন তাঁকে ডেকে বলল, 'এখানে আস'। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিকে নজর দিলেন না। জিবরীল বলেন, ঐ ব্যক্তি আপনাকে ইহুদীবাদের দিকে ডাকছে। অন্য দিক থেকে আরেকজন ডাকছে, 'এদিকে আস।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এবারও সেই আওয়াজের দিকে দৃষ্টি দিলেন না। জিবরীল বলেন, ঐ ব্যক্তি আপনাকে খৃস্টবাদের দিকে ডাকছে। তারপর আকর্ষণীয় পোষাকে সুসজ্জিত একজন মহিলা তাঁকে নিজের দিকে ডাকে। নবী (সা) সেই দিক থেকে নিজ চোখ ফিরিয়ে নিলেন। জিবরীল তা দেখে বলেন, এই স্ত্রীলোকটি হচ্ছে দুনিয়া, তারপর একজন বৃদ্ধা মহিলা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়। জিবরীল বলেন, এই বৃদ্ধার অবশিষ্ট বয়স থেকে আপনি এই দুনিয়ার বয়স আন্দাজ করতে পারেন। তারপর তাঁরা আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন যে রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিকে লক্ষ্য করলেন না। জিবরীল বলেন, এটি হচ্ছে শয়তান যে আপনাকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে।

বাইতুল মাকদিস পৌছার পর তিনি বোরাককে মসজিদে আকসার পশ্চিম দেয়ালের সাথে বাঁধেন। সেই দেয়ালের নাম হচ্ছে হায়েত আল-বোরাক বা বোরাক দেয়াল। তাঁর আগের নবীরাও এই একই দেয়ালে সওয়ারী বাঁধেন। যখন তিনি হযরত সুলাইমান (আ)-এর তৈরী মসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করেন তখন পৃথিবীর শুরু থেকে ঐ পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবীকে উপস্থিত দেখতে পান। তাঁর উপস্থিতি উপলক্ষে সবাই জামাতে নামায আদায় করেন। কে ইমামতি করবেন তা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিলেন। জিবরীল (আ) হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে হাতে ধরে সামনে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেন। তিনি সবাইকে নিয়ে নামায পড়েন।

নামায শেষে তাঁর কাছে তিনটি পান পাত্র হাজির করা হয়। একটাতে পানি, একটাতে দুধ এবং অন্যটিতে মদ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) দুধ পাত্র নির্বাচন করায় বিজরীল তাঁকে স্বভাবজাত জিনিস পছন্দ করার জন্য অভিনন্দন জানান।

তারপর একটি মই আনা হয়। জিবরীল (আ) তাঁকে উর্ধাকাশে নিয়ে যান। আরবীতে 'মই' কে মে'রাজ বলা হয়। তাই গোটা সফরের নামকরণ করা হয় মে'রাজ।

প্রথম আসমানে পৌছার পর তাঁরা গেট বন্ধ দেখতে পেলেন। পাহারাদার ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, কে? জিবরীল নিজের নাম বলেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়, 'সাথে কে'? জিবরীল বলেন, 'মুহাম্মাদ'। পুনরায় প্রশ্ন, 'তিনি কি আমন্ত্রিত?' জিবরীল বলেন 'হাঁ'। তারপর গেট খুলে দেয়া হল এবং রাসূলুল্লাহকে স্বাগত জানানো হল। তাঁকে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ফেরেশতা এবং গুরুত্বপূর্ণ নেককার ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। সেখানে উপস্থিত এমন এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার বাহ্যিক চেহারা ছিল পরিপক্ক। তাঁর শরীর ও চেহারায় কোন ক্রটি ছিল না। জিবরীল বলেন, তিনি হচ্ছেন আপনার পূর্বপুরুষ আদম (আ)। তাঁর ডানে-বামে বহু লোক উপস্থিত ছিল। তিনি ডানদিকে লক্ষ্য করে হাসেন এবং বামদিকে লক্ষ্য করে কাঁদেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে বলা হল, তারা আদম সন্তান। ডানের নেক লোকদের দিকে তাকিয়ে আদম (আ) খুশী হন এবং বামের পাপী লোকদের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত হন।

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে চারদিকে ঘুরে-ফিরে বিস্তারিত দেখার সুযোগ দেয়া হয়। তিনি এক ময়দানে দেখতে পান, কিছু লোক ফসল কাটছে। যতই কাটছে, ততই ফসল জন্মাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কারা'? উত্তর দেয়া হল, 'তারা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী (মুজাহিদ) লোক'।

তিনি দেখলেন, কিছু লোক নিজেদের মাথায় পাথর দিয়ে অব্যাহতভাবে আঘাত করছে। তিনি তাদের বিষয়ে জানতে চাইলেন। তাঁকে বলা হল, 'তারা হচ্ছে ঐ সকল গোঁড়া লোক যারা নামাযের জন্য ঘুম থেকে উঠত না'।

তিনি আরেক দল লোক দেখেন, যারা জামার সামনে ও পিছনে তালি লাগিয়েছে। তারা পশুর মত মাঠে চরে ঘাস খাচ্ছে। তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?' তঁকে জানানো হল, 'এরা নিজেদের সম্পদ থেকে যাকাত কিংবা ভিক্ষা দিত না'।

তিনি একজন লোককে দেখলেন, সে কাঠ যোগাড় করে বোঝা বাঁধছে। যখন

তা ওজনে ভারী হয় সে তাতে আরো কাঠ যোগ করে বহন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ বোকা লোকটিকে তা জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে বলা হল, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে নিজের শক্তি সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং দায়িত্ব কমানোর পরিবর্তে তা আরো বাড়িয়ে নিয়েছিল। (ফলে সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেনি।)

তিনি কিছু লোককে দেখলেন, তাদের ঠোঁট ও জিহ্বা কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তাঁকে জানানো হয় যে, এ সকল লোক দায়িত্বহীন কথা বলে লোকদের দুঃখ কষ্ট বাড়িয়েছিল।

তিনি এক জায়গায় দেখলেন, পাথরের ভেতর থেকে একটি ষাঁড় বেরিয়ে আসছে। তারপর ষাঁড়টি পুনরায় পাথরের ভেতরে ঢুকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর তাৎপর্য জিজ্ঞেস করায় জিবরীল (আ) ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এটা হচ্ছে সেই ব্যক্তির উদাহরণ, যে ভেবে-চিন্তে কথা না বলে পরে ক্ষতি উপলব্ধি করে তা প্রত্যাহার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়।

তিনি অন্য এক জায়াগায় দেখেন, কিছু লোক নিজের শরীরের গোশত কেটে নিজে তা খাচ্ছে। তিনি তাদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারেন যে, তারা অন্যদের ব্যাপারে অপমানজনক মন্তব্য করত।

তিনি তাদের কাছে কিছু লোককে আঙ্গুলে তামার নখ পরে নিজেদের শরীরে অব্যাহত আঘাত করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে বলা হল, 'এরা হচ্ছে নিন্দুক। যারা মানুষের নিন্দা ও গীবত করে বেড়াত।

তিনি আরো দেখেন, কিছু লোকের ঠোঁট উটের মত বড়। তারা আগুন খাচ্ছে। তাঁকে বলা হল, এরা হচ্ছে ইয়াতীমের মাল ভোগকারী।

তিনি কিছুসংখ্যক লোক দেখলেন, যাদের সাপভর্তি বড় বড় পেট। তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীরা তাদেরকে পদদলিত করে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের নড়াচড়া করার কোন শক্তি নেই। তাদের সম্পর্কে তাঁকে বলা হল যে, তারা হচ্ছে, সুদখোর।

তিনি আরো কিছু লোক দেখেন, যাদের একপাশে পরিষ্কার গোশত এবং অন্য পাশে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত গোশত রয়েছে। তারা ভাল গোশতের দিকে কোন নজরই দিচ্ছে না, বরং পচা গোশতগুলো খাচ্ছে। তাদের সম্পর্কে জিবরীল বলেন, তারা হচ্ছে বিবাহিত যেনাকারী নারী ও পুরুষ।

তিনি কিছু মহিলাকে দেখলেন তাদেরকে তাদের স্তনের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে

রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেস করায় তাঁকে জানানো হল, তারা হচ্ছে সেই সব মহিলা যারা সন্তানকে তার আসল জন্মদাতা পিতার পরিবর্তে অন্য বাপের সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

ভ্রমণের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) একজন ফেরেশতাকে শান্তভাবে তাঁকে স্বাগত জানাতে দেখেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল ফেরেশতা তাঁকে অত্যন্ত আনন্দ ও খুশী সহকারে স্বাগত জানান। তিনি ঐ ফেরেশতার এ ধরনের ঠাণ্ডা আচরণের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। জিবরীল বলেন, সে হচ্ছে দোজখের রক্ষক ফেরেশতা।

দোজখের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) তা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জিবরীল রাসূলুল্লাহর (সা) চোখের পর্দা তুলে দেন। ফলে, তিনি দোজখের ভয়াবহ বিশাল অবস্থা দেখেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যা যা দেখার তা দেখার পর দ্বিতীয় আসমানে ওঠেন। সেখানে তিনি যে সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে দেখেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুইজন যুবক। একজন হচ্ছেন হযরত ইয়াহইয়া (আ) এবং অন্যজন হচ্ছেন হযরত ঈসা (আ)।

তৃতীয় আসমানে যাওয়ার পর তিনি সেখানে সর্বাধিক সুন্দর একজন লোক দেখতে পান। জিজ্ঞেস করায় জানতে পারেন যে, তিনি হচ্ছে, হযরত ইউসূফ (আ)।

৪র্থ আসমানে তিনি হযরত ইদ্রিস (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন এবং ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাত পান।

৭ম আসনে তিনি বিরাট এক প্রাসাদ এবং বাইতুল মা'মুর দেখতে পান। বাইতুল মা'মুরের চারদিকে অসংখ্য ফেরেশতা তওয়াফ করছে। বিরাট প্রাসাদের কাছে তিনি নিজের মত এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ)।

তারপর তাঁকে আরো উপরে নেয়া হয়। তিনি 'সিদতারাতুল মুনতাহা' নামক স্থানে পৌছেন। এই স্থানটিকে আল্লাহর আরশ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্যে একটি শূন্য এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা) লক্ষ্য করলেন, তাঁর সাথে আগত ফেরেশতারা এই পর্যন্ত পৌছে প্রয়োজনীয় বার্তা নিয়ে ফিরে আসেন। এর উপরে যাওয়ার অনুমতি নেই।

এই স্থানেই রাসূলুল্লাহকে (সা) নেক লোকদের উদেশ্যে তৈরি বেহেশত ও প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেখানো হয়। ঐ বেহেশতী নিয়ামাত সম্পর্কে ইতিপূর্বে কেউ কানে শুনেনি এবং চোখেও দেখেনি।

এই স্থানেই জিবরীল (আ) থেমে গেলেন। এবার রাসূলুল্লাহর (সা) একাকীই সামনে অগ্রসর হওয়ার পালা। যখন তিনি একটি উঁচু সমতল স্থানে পৌঁছেন, তখন তিনি নিজেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে উপস্থিত দেখতে পান। তাঁকে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। আল্লাহর সাথে তাঁর আলোচনার কয়েকটি বিষয় হল নিম্নরূপ ঃ

১. দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামায বাধ্যতামূলক করা হয়।
২. কুরআনের সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত নাযিল হয়।
৩. শিরক্ গুনাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকল গুনাহ্ মাফের সম্ভাবনা ঘোষণা করা হয়।
৪. কোন ব্যক্তি নেক কাজের নিয়ত করা মাত্রই তার আমলনামায় ১ নেকি এবং কাজটি করার পর ১০ নেকি লেখা হবে। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তি পাপ কাজ করার নিয়ত করা মাত্র তার আমলনামায় গোনাহ লেখা হবে না এবং গুনাহর কাজটি করার পর মাত্র ১টি গুনাহ্ লেখা হবে।

উপরোক্ত শিক্ষা ও বাণী লাভ করার পর তিনি মহান আল্লাহর দরবার থেকে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে আসেন। পথে মূসা (আ)-এর সাক্ষাত ঘটে এবং তাঁর কাছে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার বর্ণনা দেন। মূসা (আ) তাঁকে বলেন, বনি ইসরাইলের সাথে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে আমার পরামর্শ হল, আপনার উম্মাহ দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামাযের বোঝা বহন করতে পারবে না। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং নামাযের ওয়াক্তের সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। আল্লাহ্ ১০ ওয়াক্ত নামায হ্রাস করেন। তিনি আবর ফিরে আসার পর হযরত মূসার (আ) সাথে সাক্ষাত হয়। মূসা (আ) এবারও পরামর্শ দিলেন যে, এই সংখ্যাও অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় আল্লাহর দরবারে ফিরে যান এবং এভাবে বেশ কয়েক দফা উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় এবং প্রত্যেকবারই নামাযের সংখ্যা কিছু কমানো হয়। সর্বশেষে ৫ ওয়াক্ত নামায বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ৫০ ওয়াক্ত নামাযের সাওয়াব দানের ওয়াদা দেয়া হবে।

উর্ধ্বাকাশ সফর শেষে নবী (সা) একই মই দ্বারা মসজিদে আকসার আঙিনায় অবতরণ করেন। সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম পুনরায় সেখানে সমবেত হন। তিনি সবাইকে নিয়ে নামায পড়েন এবং ইমামতি করেন। সম্ভবতঃ সেটি ছিল ফযরের

নামায। তারপর তিনি একই বোরাকে চড়ে পুনরায় মক্কা ফিরে আসেন।

সকালবেলা তিনি সর্বপ্রথম নিজ চাচাতো বোন উম্মে হানির কাছে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করারও দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু উম্মে হানি তাঁর জামার নিচের অংশ টেনে ধরেন এবং ঘটনাটি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ জানান। উম্মে হানি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, অন্যরা এই ঘটনা শুনে কৌতুক করবে। কিন্তু নবী (সা) বললেন, আমি অবশ্যই তাদের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করবো। এই বলে তিনি রওনা করলেন।

হারাম শরীফে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে আবু জাহলের সাক্ষাত ঘটে। সে কৌতুক করে রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করে, নতুন কোন খবর আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে 'হাঁ' সূচক জবাব দেন এবং বলেন, গতরাত আমি জেরুসালেমে ছিলাম। আবু জাহল তা শুনে উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি লোকদেরকে এখানে জড় করলে তুমি কি তাদের সামনে ঘটনাটি পুনরায় প্রকাশ করবে? রাসূলুল্লাহ (সা) শান্তভাবে দৃঢ়চিত্তে জবাব দিলেন, 'অবশ্যই'। আবু জাহল চিৎকার দিয়ে যাদেরকে সামনে পায়, তাদেরকেই হরাম শরীফে জড় হওয়ার আহ্বান জানায়।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক উপস্থিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের সামনে পুরা সফর কাহিনী বর্ণনা করেন। তারা সবাই কৌতুক করতে থাকে এবং বলে, দুই মাসের সফর মাত্র ১ রাত্রিতে? এটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। আমরা আগে সন্দেহে ছিলাম যে, আপনি পাগল, কিন্তু এখন তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। বনে আগুন ধরার মত তাঁর মে'রাজের ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুলোক হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দিকের কাছে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা জানতে চায়। তাদের আশা ছিল, আবু বাক্‌র (রা) যদি তা প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে ইসলামী আন্দোলন মক্কা থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। হযরত আবু বাক্‌র (রা) পুরো ঘটনা শুনার পর মন্তব্য করেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) তা বলে থাকেন, তাহলে তা অবশ্যই সত্য হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার নতুন কিছু নেই। আমি প্রতিদিনই তাঁর কাছে ফেরেশতার আগমন ও আল্লাহর বার্তা নাযিলের খবর শুনি এবং তা বিশ্বাস করি।

আবু বাক্‌র (রা) হারাম শরীফের দিকে অগ্রসর হন। তখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আগত লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি যা শুনেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) তা বলেছেন কিনা তা জিজ্ঞেস করেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) 'হাঁ' সূচক জবাব দেন, তখন আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি জেরুসালেম ও সেখানকার

মসজিদ দেখেছি। আপনি দয়া করে বলুন, সেগুলো কি রকম? সবাই জানে যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইতিপূর্বে কখনও জেরুসালেম সফর করেননি। কিন্তু তিনি বিস্ত ারিত বর্ণনা দিতে থাকলেন যা শুধুমাত্র শুনে বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। তিনি এমনভাবে জীবন্ত বর্ণনা দেন যেন জেরুসালেম তাঁর চোখের সামনে। এইভাবে আবু বাক্র প্রশ্ন করতে থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যথার্থ জবাব দিতে থাকেন। তখন সন্দেহকারীরা বিষয়টি পুনর্বিবেচনা শুরু করে। তাদের অনেকেই জেরুসালেম দেখেছে। তাদের মন বলছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা দিচ্ছেন তা সত্য, তথাপি তারা আরো বেশী প্রমাণ তালাশ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন, তিনি যাওয়ার পথে অমুক অমুক কাফেলাকে অমুক অমুক দ্রব্য সহকারে বোরাকের পাশে দেখেছেন। একটি উট উপত্যকায় দৌড়ে চলে গেল। তিনি কাফেলার লোকদেরকে সে বিষয়ে অবগত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, আমার প্রত্যাবর্তনের সময় আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের লোকদেরকে দেখতে পেয়েছি। তারা ঘুমাচ্ছিল। আমি তাদের একটি পাত্র থেকে পানি পান করে এর নমুনা রেখে এসেছি।

তিনি আরো কিছু ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন এবং আরো কিছু কাফেলা সম্পর্কে কথা বলেন। পরবর্তীতে ঐ সকল কাফেলা মক্কা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। ফলে সন্দেহকারীরা চুপ হয়ে যায়। কিন্তু অনেকেই আশ্চর্য হয়ে যায় যে, কি করে এ ঘটনা ঘটল।

[Radio Speeches, Islamic Publications, Lahore]

এই ঘটনাতো অবশ্যই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ও আশ্চর্য বিষয়। এর উপর বড় কোন ঘটনা ঘটেনি এবং আর ঘটারও সম্ভাবনা নেই।

মে'রাজের ঘটনা কিভাবে বাইতুল মাকদিস ও মসজিদে আকসার সাথে জড়িত, উক্ত বর্ণনা দ্বারা তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই মুসলমানদের কাছে এই শহর ও মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মসজিদ ও শহরটিকে ভুলে থাকা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই পবিত্র শহরের উপর অন্য কোন অমুসলিম শক্তির জবরদখল, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শাসন কোনটাই মুসলমানদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই তাকে মুক্ত করার জন্য সালাহউদ্দিন আইউবীর মত বীরপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। সকল যুগেই মসজিদে আকসার হেফাজতকারী ও উদ্ধারকারী সালাহউদ্দীনের প্রয়োজন। আল্লাহ মুসলমানদেরকে শক্তি দিন এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য জাগ্রত করুন।

মসজিদে আকসার প্রাচীন ইতিহাস

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করি, যমীনে প্রথম কোন্ মসজিদ তৈরি হয়েছিল? তিন উত্তরে বলেন, 'মসজিদে হারাম'। আমি জিজ্ঞেস করি, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, 'মসজিদে আকসা'। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করি, এ দুটোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বলেন, '৪০ বছর'।

যারা বলেন, হযরত সুলাইমান (আ) মসজিদে আকসা তৈরী করেছেন, তাদের এই বক্তব্যের উপর প্রশ্ন জাগে, ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সুলাইমান (আ)-এর সময়ের ব্যবধান হচ্ছে এক হাজার বছর। অথচ উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, কা'বার ৪০ বছর পর মসজিদে আকসা তৈরি হয়েছে।

ইবনুল যাওজী এই প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, হাদীসে মসজিদে আকসার প্রথম ভিত্তির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আ) যেমনি কা'বার প্রতিষ্ঠাতা নন, তেমনি সুলাইমান (আ)ও মসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা নন। বরং তাঁরা ২ জন হচ্ছেন পুনঃনির্মাণকারী। কাবার মূল প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন, হযরত আদম (আ)। পরবর্তীতে, বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সন্তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কেউ ৪০ বছর পর মসজিদে আকসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২০]

আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যমীনের উপর প্রথম মসজিদ হচ্ছে মসজিদে হারাম যা ইবরাহীম (আ) তৈরি করেছেন। আর মসজিদে আকসা হচ্ছে ২য় মসজিদ, যা কা'বা শরীফ প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পর হযরত ইয়াকুব (আ) তৈরি করেন। তারপর দাউদ (আ) তার সংস্কার করেন এবং সুলাইমান (আ) এর পূর্ণতা সাধন করেন।[২১]

অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর মসজিদে আকসা নির্মাণ করেন।[২২]

এবার আমরা মসজিদে আকসার নির্মাণ ও সংস্কার সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করবো।

---

২০. অফা-আল-অফা, নূরুদ্দিন সমাহুদী।

২১. আত্-তাতাউর আল-উমরানী লি-মাদীনাতিল কুদস ডঃ আলীম খোদার।

২২. কাবলা আনইউ হাদ্দাসা আল-আকসা, আবদুল আযীয মোস্তফা।

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ

হযরত ইবরাহীম (আ) মসজিদে আকসা নির্মাণ করেছেন বলে ইতিপূর্বে আমরা এক বর্ণনায় জানতে পেরেছি। তিনি নিজ জন্মভূমি ইরাকে ইসলাম প্রচারের অভিযোগে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত হন এবং পরে ইরাক থেকে সিরিয়ায় হিজরাত করেন। তিনি তাঁর আশ্রয়কেন্দ্র সিরিয়ায় দীর্ঘদিন বসবাস করেন। তিনি ইরাক থেকে নিজের মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ত্যাগ করেন আল্লাহর দীনের স্বার্থে হিজরাত করে। তারপর সিরিয়ায় যখন চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তিনি মিসরে চলে যান। মিসরের ফেরাউন তাঁর স্ত্রী সারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনার পর তিনি পুনরায় সিরিয়ায় ফিরে আসেন। মিসরের ফেরাউন সম্ভ্রান্ত কারাবন্দী হাজারকে সারার প্রতি উপহার দেয়। হাজারও ঐ সফরে হযরত ইবরাহীমের (আ) সফর-সঙ্গিনী ছিলেন। সারা হাজারকে ইবরাহীমের (আ) উদ্দেশ্যে উপহার দেন। হাজারের ঘরে হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

আল খলীল শহরে মসজিদে ইবরাহীম এর ভেতর এক গুহায় হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) এবং তাঁদের স্ত্রীদের কবর রয়েছে।
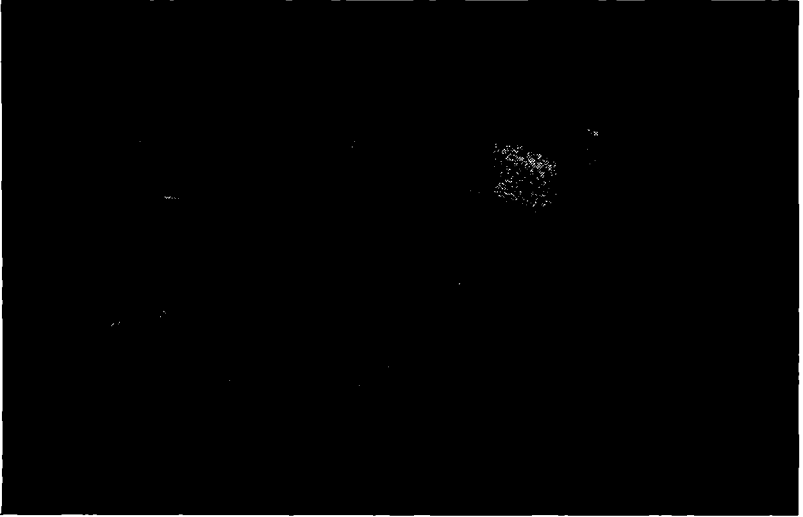
আল খলীল শহরে মসজিদে ইবরাহীম। এর ভেতরে এক গুহায় হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) এবং তাঁদের স্ত্রীদের কবর রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ) হাজার ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে মক্কার নির্জন মরুভূমিতে রেখে যান। মক্কায় কোন কৃষি আবাদী ছিল না। তিনি সেখানে ইসমাঈলকে (আ) সাথে নিয়ে কা'বা শরীফ তৈরী করেন। তারপর তিনি পুনরায় সিরিয়া ফিরে আসেন। তখন জেরুসালেম সিরিয়ার অধীন ছিল। কা'বা শরীফ তৈরির ৪০ বছর পর তিনি মসজিদে আকসা তৈরি করেন।

২. হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর যুগ

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের দশ বছরেরও বেশী সময় পরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরবর্তী সন্তান ইসহাকের জন্ম হয়। ইসমাঈলের মত ইসহাকও নবী ছিলেন। হযরত ইসহাকের ঘরে দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন ইয়াকুব ও ইসু। হযরত ইয়াকুব (আ) নবী ছিলেন। তবে ইসু নবী ছিলেন না। ইয়াকুবের উপাধি ছিল ইসরাইল। তাঁর দিকে সম্বোধন করে তাঁর বংশধরকে বনু ইসরাইল বলা হয়। পরবর্তীতে ইসুর পরিবর্তে ইয়াকুবের বংশের মধ্যে নবুওয়াত বিদ্যমান থাকে।

হযরত ইবরাহীম (আ) সাখরার স্থানে যে মসজিদে আকসা নির্মাণ করেন, তা দুর্বল হয়ে পড়ায় হযরত ইয়াকুব (আ) তা সংস্কার করেন।[২৩]

৩. হযরত মূসার (আ) যুগ

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর শেষ বয়সে বনু ইসরাইল হযরত ইউসূফ (আ) এর আহ্বানে মিসর প্রবেশ করে। উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুবের সন্তান ও আল্লাহর নবী ছিলেন। পরবর্তীতে বনু ইসরাইল মিসরে ফেরাউনের দ্বারা নির্যাতিত হয়। হযরত মূসা (আ)-এর যুগে তাঁর সাহায্যে বনু ইসরাইল মিসর ত্যাগ করে। ফলে, পুনরায় তাদের জেরুসালেমের পবিত্র স্থানে ফিরে আসার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু জেরুসালেমের জালেম অধিবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে। তাদের এই জিহাদ-বিমুখিতার জন্য আল্লাহ সিনাই মরু প্রান্তরের তীহ ময়দানে তাদেরকে ৪০ বছর মরু জিন্দেগী যাপনের শাস্তি দান করেন। কিন্তু তারা জেরুসালেমে পুনরায় ফিরে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্য তা সফল হচ্ছিল না।

কুরআন বনি ইসরাইলের ঐ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছে। ঘটনা

---

২৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, হাফেজ ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ

হচ্ছে এই যে, ফেরাউন মিসরে বনি ইসরাইলের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে। সে তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করে মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত রাখে। পরে মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে মজলুম জনতার উদ্দেশ্যে সাগর শুকিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবলকে সাগরের পানিতে ডুবিয়ে মারেন।

বনু ইসরাইল সাগর পেরিয়ে সিনাই মরু প্রান্তরে উপস্থিত হয়। সিনাই প্রান্তরে পূর্ব থেকেই এক মূর্তিপূজারী জাতির বাস ছিল। বনু ইসরাইল তাদের কাছে আল্লাহর বিভিন্ন প্রতিকৃতি বা মূর্তি এবং সেগুলোতে পশু উৎসর্গসহ সেজদা করা দেখে মূসা (আ)-এর কাছে এসে আবেদন করে, হে মূসা! তাদের মত আমাদের জন্যও মাবুদ বানিয়ে দাও। এতে মূসা ভীষণ রাগ করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা বোকা জাতি। সিনাই প্রান্তরের অধিবাসীরা যা করছে তা সম্পূর্ণ বাতিল ও ধ্বংসাত্মক কাজ। তোমরা কি চাও, যে আল্লাহ তোমাদেরকে গোটা বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তার পরিবর্তে আমি তোমাদের জন্য হাতের তৈরি অন্য মাবুদ পেশ করি? মূসা (আ) তাদের এই অন্যায় আবদার এভাবে প্রত্যাখান করেন।

তিনি তাদেরকে নিয়ে বাইতুল মাকদিস অভিমুখে রওনা দেন। কিন্তু বাইতুল মাকদিসের জালেম শাসক ও অধিবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া সহজভাবে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তখন মূসা (আ) বনি ইসরাইলকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা কি আল্লাহর নিয়ামাত স্বীকার কর? আল্লাহ তোমাদের মধ্যে নবী পাঠিয়েছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন। তোমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন যা আর কাউকে দেয়া হয় নি। তোমরা বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ কর এবং এ ব্যাপারে পিছটান দেবে না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তারা জওয়াব দিল, হে মূসা! বাইতুল মাকদিসে এক জালেম শক্তিধর জাতি বাস করে। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না গেলে আমরা সেখানে যাব না। 'তখন আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণকারী ও নিয়ামাত প্রাপ্ত দু'ব্যক্তি বললো, তোমরা শহরের প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। তোমরা আল্লাহর উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা মুমিন হও।'

বনু ইসরাইল উত্তরে বলে, হে মূসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত শহরে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানে ঢুকবো না। তুমি এবং তোমার রব যাও ও সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে দিয়ে আস। আমরা এখানেই বসে আছি।

এর উত্তরে মূসা (আ) বলেন, হে রব! আমি আমার ও আমার ভাই হারুন ছাড়া আর কারুর উপর নিয়ন্ত্রণকারী নই। আমার ও আমার কওমের মধ্যে তুমি

ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও। আল্লাহ এই দোয়ার জওয়াবে বলেন, তাদের জন্য বাইতুল মাকদিস চল্লিশ বছর পর্যন্ত হারাম করা হল এবং তারা যমীনে ঘুরাফিরা করতে থাকবে। তুমি জালেম কাওমের আচরণে নিরাশ হয়ো না।

বনু ইসরাইল সিনাই মরুভূমির কঠিন পানিশূন্য তীহ প্রান্তরে পড়ে রইল। পানির পিপাসায় অস্থির হয়ে মূসা (আ)-এর কাছে পানি প্রার্থনা করল। মূসা (আ) আল্লাহর কাছে পানির আবেদন জানাল। আল্লাহ তাঁকে নিজ লাঠি দ্বারা একটি পাথরে আঘাত করার নির্দেশ দেন। ফলে, ১২ গোত্রে বিভক্ত বনি ইসরাইলের জন্য ১২টি ঝর্নাধারা ফুটে উঠল। তারা সেই পানি থেকে সবাই প্রয়োজন পূরণ করতে লাগল।

এরপর তাদের খাদ্য সমস্যা দেখা দিল। তারা মূসা (আ)-এর কাছে খাবার চেয়ে বসল। ফলে, মূসা (আ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং বনি ইসরাইলের জন্য 'মান্না ও সালওয়া' নামক খাদ্য পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু বনি ইসরাইল তাতে বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং মূসা (আ)-এর কাছে ফরিয়াদ করে। হে মূসা! আমরা, একই প্রকার খাওয়ার উপর বিরক্ত হয়ে পড়েছি। তুমি তোমার রবের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদেরকে যমীনের উৎপাদিত সব্জি-তরকারী, সিম, ডাল ও পেঁয়াজ দান করেন।

এতে মূসা (আ) রাগ হন এবং প্রশ্ন করেন, তোমরা কি নিকৃষ্ট জিনিসের জন্য উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তন কামনা কর? যদি তাই চাও, তাহলে তোমরা শহরে ছড়িয়ে পড় এবং সেখানে তোমরা যা চাবে, তাই পাবে।

এদিকে মূসা (আ) আল্লাহর সাথে নির্ধারিত কর্মসূচী মোতাবেক ৩০ দিনের জন্য তূর পাহাড়ে চলে যান। তিনি নিজ কাওমকে ৩০ দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। কিন্তু আরো ১০ দিন থেকে মেয়াদ পূর্ণ করায় এবং ফিরতে দেরী হওয়ায় তাদের কাছে সামেরী নামক এক লোক এসে প্রস্তাব করে, মূসা আটকা পড়েছে এবং তোমাদের কাছে আর ফিরে আসবে না। তাই তোমাদের উচিত, একটি উপাস্য গ্রহণ করা। বনি ইসরাইল প্রস্তাবটি চিন্তা করে দেখল, প্রস্তাবটি ছিল তাদের মনের মত। ইতিপূর্বেও তারা মূসা (আ)-এর কাছে অনুরূপ উপাস্য তৈরির দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু মূসা (আ) তা অস্বীকার করেছিলেন।

যাই হোক, সামেরী সোনার তৈরী একটি গো-বাছুর নিয়ে আসল এবং গো-বাছুরটি আওয়াজ দিতে পারত। বনু ইসরাইল গো-বাছুরের পূজা আরম্ভ করল। সামেরী বলল, এটা তোমাদের এবং মূসার উপাস্য।

হযরত মূসার স্থলাভিষিক্ত হযরত হারুন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের রব হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ-রাহমান। তোমরা আমার অনুসরণ ও আনুগত্য কর। তারা জবাবে বলেন, আমরা মূসা (আ) ফিরে না আসা পর্যন্ত এইভাবে মূর্তিপূজা করতে থাকবো।

হযরত মূসা ফিরে আসেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের উপর অত্যন্ত রাগ করেন। তিনি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনে সেদিকে অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, তাঁর কাওমের লোকেরা গো-মূর্তির নাচ-গান করেছে। তিনি রাগ করে বলেন, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছে! তারপর তিনি হাত থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তাওরাত ফেলে দেন এবং প্রশ্ন করেন, হে আমার জাতি! আল্লাহ কি তোমাদের সাথে উত্তম ওয়াদা করেননি? তোমাদের কাছে কি সময় দীর্ঘায়িত হয়েছিল কিংবা তোমরা চাও যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের গযব নেমে আসুক। যে জন্য তোমরা আমার মেয়াদের অবসরে বিপরীত কাজ শুরু করে দিয়েছিলে?

মূসা (আ) হারুনকে প্রশ্ন করেন, তুমি যখন তাদেরকে গোমরাহীর কাজে লিপ্ত দেখলে, তখন কেন আমার অনুসরণ করলে না এবং কেন আমার নাফরমানী করলে? হারুন (আ) বলেন, হে ভাই! কাওম আমাকে দুর্বল মনে করে আমাকে মেরে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিল। তাই আমার বিষয়ে এমন কিছু করবেন না, যার কারণে দুশমনরা হাসতে পারে এবং আমাকে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। তখন মূসা (আ) পুনরায় প্রশ্ন করেন, তুমি তাদের উক্ত কুফরীর বিরুদ্ধে কেন লড়াই করলে না? তুমি জান যে, আমি মওজুদ থাকলে অবশ্যই লড়াই করতাম? হারুন (আ) বলেন, হে আমার ভাই! আমার দাড়ি কিংবা মাথা ধরে টান দেবেন না। আমার আশংকা হয়েছিল আপনি এই ধারণাই করবেন যে, আমি আপনার কথা স্মরণ না রেখে কাওমের সাথে আপনার দূরত্ব সৃষ্টি করেছি। তারপর মূসা (আ) বলেন, হে রব! আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। আপনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।

তারপর মূসা (আ) সামেরীকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ঘটনা ও চক্রান্তটা কি? সামেরী জওয়াবে বলল, আমি যা দেখেছি, অন্যরা তা দেখেনি। আমি জিবরীলকে দেখেছি এবং জিবরীলের পায়ের স্থান থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে

তা গো-বাছুরের প্রতিকৃতির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই চক্রান্ত করার জন্য আমার মন আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মূসা (আ) বলেন, তোমার তৈরি ঐ মূর্তিকে জ্বালিয়ে এর ছাই আমি সাগরে নিক্ষেপ করবো। মূসা (আ) মূর্তিটি ধ্বংস করে দিলেন এবং নিজ কাওমকে বললেন, তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন সেই মহান আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

এতে, বনি ইসরাইল লজ্জিত হয় এবং মূসা (আ) তাদেরকে লক্ষ্য করে প্রস্তাব করেন, হে কাওম! তোমরা গো-বাছুরের প্রতিকৃতিকে মাবুদ বানিয়ে নিজেদের উপর যুলুম করেছ। তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর এবং নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার কাছে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।

বনি ইসরাইল আল্লাহর কাছে তওবা করার সিদ্ধান্ত নিল এবং মূসা (আ)-কে তা জানাল। তখন মূসা (আ) বনি ইসরাইলের ৭০ জন আলেম নির্বাচিত করেন এবং তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে বনি ইসরাইলের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী হন। মূসা (আ) আল্লাহর কাছে গো-বাছুরের প্রতিকৃতি পূজার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

তিনি বনি ইসরাইলের কাছে ফিরে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার কথা জানান। কিন্তু তারা গোঁ ধরে বসে এবং বলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্য না দেখা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না।' তাদের এই অপরাধের জন্য আকাশ থেকে এক বজ্রপাতের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তখন মূসা (আ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, হে রব! তুমি ইচ্ছা করলে, তাদেরকে আমার আগমনের আগেও ধ্বংস করে দিতে পারতে। তুমি কি আমাদেরকে আমাদের মূর্খ লোকদের অপকর্মের জন্য ধ্বংস করে দেবে? এটা হচ্ছে তোমার পরীক্ষা, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান কিংবা গোমরাহ করে থাক। তুমি আমাদের প্রভু! আমাদেরকে মাফ কর ও রহমত দান কর। তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

আল্লাহ বলেন, আমি যাকে ইচ্ছা আযাব দিই এবং সবকিছুর উপর আমার রহমত ছেয়ে আছে। কিন্তু মূসা (আ) দোয়া অব্যাহত রাখেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ ঐ মৃতলোকদেরকে পুনরায় জীবিত করেন। আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় জীবন দান করেন।

কিন্তু কি পরিহাস! বনি ইসরাইল তাদের মুক্তিদাতা মূসা ও হারুন (আ) এর

বিরুদ্ধে কাওরাহ বিন বাসহারের নেতৃত্বে বিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কাওরাহ বনি ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় আড়াইশ' লোকের এক সভায় হযরত মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করে। বনি ইসরাইলের অধিকাংশ লোক এই সামষ্টিক বিদ্রোহের আহ্বানে সাড়া দেয়। সবাই মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং বলে, তোমরা ২ ব্যক্তি বনি ইসরাইলের ধ্বংসকারী। আল্লাহ মূসা ও হারুনের অনুসারী সত্যপন্থীদেরকে সাহায্য করেন এবং ১৪ হাজার বিদ্রোহীকে এক মহামারীর মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। তাওরাতে বর্ণিত আছে যে, বিশ বছর বয়স্ক অধিকাংশ যুবক মারা গেছে। তীহ প্রান্তরের অবশিষ্ট লোকিদের জন্য ৪০ বছর সশ্রম দণ্ড ঘোষণা করে বলা হয়, তাদেরকে এই ময়দানে ৪০ বছর কাটাতে হবে। তীহ ময়দানে হযরত মূসা ও হারুন (আ) ইন্তিকাল করেন। তাঁরা দুইজনও জেরুসালেমে প্রবেশের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। যখন তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই কাপুরুষ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে জিহাদের মাধ্যমে জেরুসালেম জয় করা সম্ভব নয় তখন তাঁরা জেরুসালেমের অতি নিকটে, পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের মধ্যে নিজেদের লাশ দাফনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁদের সেই দোয়া কবুল করেন এবং তাঁদের আগ্রহ মোতাবেক তাঁদেরকে জেরুসালেমের কাছে দাফন করা হয়। বুখারী শরীফে কিতাবুল আম্বিয়া অধ্যায়ে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) জেরুসালেমে হযরত মূসার কবরের স্থান চিহ্নিত করার আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, আমি হযরত মূসার (আ) কবর দেখতে পাচ্ছি। এই আমলে মসজিদে আকসায় পৌছার ব্যাপারে বনি ইসরাইলের জিহাদবিমুখতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন কিছু নেই।

৪. ইউশা' বিন নূন (আ) এর যুগ

হযরত মূসা ও হারুনের (আ) পরবর্তী নবী হলেন ইউশা' বিন নূন। সূরা কাহাফে যে যুবকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন, হযরত ইউশা' (আ)। সহীহ হাদীসের মাধ্যমেও তা প্রতিষ্ঠিত। তিনি তীহ ময়দানের অবশিষ্ট বনি ইসরাইলকে জেরুসালেম যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, সেটি হচ্ছে, ঈমানদারদের স্থান, কাফির-মুশরিকের স্থান নয়। তিনি বনি ইসরাইলের পরবর্তী বংশধরকে নিয়ে জেরুসালেম পৌছেন। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে বাইতুল মাকদিস অবরোধ করেন এবং সূর্যাস্তের মুহূর্তে বিজয় সন্নিকট হওয়ায় আল্লাহর কাছে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত সূর্যকে আটকিয়ে রাখার দোয়া করেন।

আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন।[২৪] তিনি নিজ বাহিনী নিয়ে বাইতুল মাকদিসে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন এবং সাখরার স্থানে 'গম্বুজে মূসা' নির্মাণ করেন। তাঁরা সেই গম্বুজের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তারপর তাঁরা তার পরিবর্তে সাখরার দিকে মুখ করে নামায পড়া শুরু করেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত তা সবার কিবলা ছিল। রাসূলুল্লাহ্র (সা) আমলে ১৭ মাস পর্যন্ত মুসলমানগণ মদীনায় বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় কা'বা শরীফের দিকে কিবলাহ্ পরিবর্তন হয়ে যায়।

৫. ইউশা' বিন নূন পরবর্তী যুগ

হযরত ইউশা' বিন নূনের পরে জেরুসালেমে বনি ইসরাইলের উপর তিন ধরনের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ১ম ধরনের শাসনপদ্ধতি হচ্ছে বিচারক গোষ্ঠীর শাসন। বনি ইসরাইলের ১২ বংশের বিচারপতিরা মিলে সুদীর্ঘ চারশ' বছর পযর্ন্ত জেরুসালেম শাসন করে। ২য় ধরনের শাসন পদ্ধতি হচ্ছে, বাদশাহী পদ্ধতি। বিচারপতিদের শাসন পদ্ধতি দুর্বল হওয়ার পর বাদশাহগণ জেরুসালেমে বনি ইসরাইলের শাসনভার পরিচালনা করেন। বিচারপতিদের দুর্বলতার সুযোগে বহিরাগত দুশমনরা জেরুসালেম দখল করে নেয়। অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে, আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকেরা বনি ইসরাইলের উপর আক্রমণ করে এবং তারা বনি ইসরাইলের কাছ থেকে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ এলাকা কেড়ে নেয়। ঐ সময় হযরত শামউইল নবী (আ) বনি ইসরাইলে শাসনভার পরিচালনা করেন। তিনি খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য বনি ইসরাইল সরদারগণ নবীর কাছে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একজন বাদশাহর আবেদন করেন। নবীর আবেদন ক্রমে আল্লাহ্ তাদের জন্য তালুত নামক একজন বাদশাহ্র আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত ও স্বার্থপরতার শিকার বনি ইসরাইল তাঁকে বাদশাহ্ হিসেবে মেনে নিতে ইতস্তত করতে থাকে। তারা বলে আমরাই তালুতের চাইতে বাদশাহ্ হওয়ার বেশি অধিকারী। শেষ পর্যন্ত তাদের যে অংশ ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল, তারা তালুতের সাথে যুদ্ধ করে জালুতকে (জুলিয়েট) পরাজিত করে। ঘটনাবশতঃ যুবক দাউদ (আ) এ সময়

---

২৪. তাফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

তালুতের বাহিনীতে ছিলেন। তিনি যুদ্ধে ফিলিস্তিনী বাহিনীর প্রধান জালুতকে হত্যা করে ইসরাইলীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এই ঘটনা কুরআন মজীদের সূরা বাকারার ২৪৬ আয়াত থেকে ২৫১ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তখন থেকে ইসরাইলীদের মধ্যে বাদশাহী পদ্ধতি শুরু হয়। তালুত তাদের বাদশাহ নিযুক্ত হন। *শামুয়েল* গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তালুত হযরত দাউদের কাছে নিজ কন্যা বিয়ে দেন এবং তালুতের পরে তিনি ইসরাইলীদের ২য় বাদশাহ নিযুক্ত হন। দাউদ (আ) জেরুসালেম শহর দখল করেন।

৩য় যুগ হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতা ও পতনের যুগ।

৬. হযরত দাউদ (আ) এর যুগ

হযরত দাউদ (আ) খৃস্টপূর্ব ৯৭৭ সালে জেরুসালেম শহর জয় করে সেখানে সিন্ধুক নিয়ে যান। তাতে হযরত মূসা ও হারুন (আ)-এর নিদর্শন ছিল। তিনি আল্লাহর নির্দেশে জেরুসালেম শহরে পবিত্র ইবাদতের স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য একটি প্রশস্ত জায়গা প্রস্তুত করেন এবং নির্মাণ কাজের জন্য সকল প্রয়োজনীয় জিনিস মওজুদ করেন। কিন্তু একজন ইয়াতীমের সম্পত্তি মসজিদের স্থানে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছার কারণে আল্লাহ তাঁকে মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেন। কেননা, অবৈধ সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইবাদতখানায় আল্লাহর পবিত্র ইবাদত করা যায় না।[২৫] তারপর দাউদ প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে দিয়ে তা নির্মাণ করাও। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, তোমার সন্তানই তা তৈরি করবে। হযরত দাউদ (আ) সাহইউন পাহাড়ে নিজ দফতর স্থাপন করেন এবং সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করেন। জেরুসালেমে রাজধানী স্থাপনের আগে ৭ বছর পর্যন্ত, আল-খলীল ছিল ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী।

৭. হযরত সুলাইমান (আ) এর যুগ

সুলাইমান (আ) জেরুসালেমে জন্মগ্রহণ করেন। বাপের ইন্তিকালের পর তিনি জেরুসালেমের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল খৃস্টপূর্ব ৯৬৩-৯২৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪০ বছর। তাঁর আমলে জেরুসালেমে বাণিজ্য ও শিল্প প্রকল্প জোরদার হয়। আরাবাহ উপত্যকার খনি থেকে লোহা ও তামা উত্তোলনের

---

২৫. অফা আল-অফা-নূরুদ্দিন সামহুদী।

ফলে রাষ্ট্রের আয় অনেক বৃদ্ধি পায়। কুরআনের তাফসীরকারগণ বলেছেন, তিনি ক্ষমতার মসনদ থেকে ৪০ দিন অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে আসেন। তাঁকে আল্লাহ এমন বিশাল বাদশাহী দিয়েছিলেন যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হয়নি।

তিনি মা'বাদে সুলাইমান তৈরির উদ্যোগ নেন। অর্থাৎ তাঁর তৈরি ইবাদতগাহকে তাঁর নামের সাথে যুক্ত করে মা'বাদে সুলাইমান বলা হয়। এর অপর নাম হচ্ছে হাইকালে সুলাইমানী। এটাকেই কুরআন মসজিদে আকসা বলে উল্লেখ করেছে। এই মসজিদ নির্মাণে ৩০ হাজার শ্রমিকের ৭ বছর সময় লেগেছিল। তিনি খুবই সুন্দর ডিজাইনে মসজিদটি তৈরি করেন। ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, 'হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগেই মসজিদে আকসা তৈরি হয়েছিল, তবে হযরত সুলাইমান (আ) তাকে বড় ও মজবুত করে তৈরি করেন।'[২৬]

৮. সুলাইমন (আ) এর পরবর্তী যুগ

হযরত সুলাইমান (আ)-এর পরে তাঁর সাম্রাজ্য দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি হচ্ছে দক্ষিণ সাম্রাজ্য। এর অপর নাম হচ্ছে 'ইহুজা' বা ইয়াহুদা। রাজধানী জেরুসালেম। সম্ভবতঃ পরবর্তীতে ইহুদী নামকরণের সাথে ঐ ইয়াহুদা নামের সম্পর্ক রয়েছে। হযরত সুলাইমান (আ)-এর ছেলে রাহাবআম হচ্ছেন ইয়াহুদা রাজ্যের রাজা।

২য়টি হচ্ছে, উত্তর সাম্রাজ্য। এর অপর নাম ইসরাইল এবং রাজধানী হচ্ছে নাবলুস কিংবা শাকীম। এই সাম্রাজ্যের রাজা হলেন সুলাইমান (আ)-এর প্রধান সেনাপতি ইউরিআম। উত্তর সাম্রাজ্য অর্থাৎ ইসরাইল দক্ষিণ সাম্রাজ্য তথা ইয়াহুদা থেকে অপেক্ষাকৃত বড় ছিল এবং অধিকাংশ ইহুদী বংশ ইসরাইলেই বাস করত।

৯. ইসরাইল ও ইয়াহুদা সাম্রাজ্যের অবসান এবং মা'বাদে সুলাইমান ধ্বংস

ইসরাইল ও ইয়াহুদার মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় খৃস্টপূর্ব ৯৭০ সালে মিসরের ফেরআউন শাইশাক জেরুসালেমসহ ইয়াহুদা সাম্রাজ্য দখল করে। ফেরাউন মা'বাদে সুলাইমানীতে সংরক্ষিত মূল্যবান জিনিসপত্র এই বলে

---

২৬. মাজমাউল ফাতাওয়া-১৭শ' খণ্ড, ৩৫১ পৃঃ।

আত্মসাত কর যে, এগুলো হযরত সুলাইমানের মিসরীয় স্ত্রী তথা রাণীর সম্পত্তি।

খৃস্টপূর্ব ৭২১ সালে আশুরীয় বাদশাহ সারজন ইসরাইল দখল করে সর্বশেষ ইসরাইলী রাজাকে আটক করে, রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে তাড়িয়ে দেয় এবং সেখানে নিজের গভর্নর নিযুক্ত করে। পরে মিসরের ফেরআউন শাইশাক আশুরীয় বাদশাহর কবল থেকে ইসরাইল দখল করে।

এই সকল রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে ব্যাবিলনের বাদশাহ বখতেনসর উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কেননা, দাজলা উপত্যকার আশুরীয় শাসক ব্যাবিলনের রাজার প্রভাব বলয়ে ছিলেন। তিনি মিসরীয় ফেরআউনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে ইয়াহুদা ও ইসরাইল দখল করেন এবং মিসরের ফেরআউন শাইশাককে পরাজিত করেন। তিনি খৃস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে মসজিদে আকসা ধ্বংস করেন। বহু বনি ইসরাইলকে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যান। কিছুসংখ্যক বনি ইসরাইল মিসরসহ অন্যান্য দেশের দিকে পালিয়ে যায়। ইতিহাসে এটাকে 'ব্যালিবনের বন্দী' যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কোরআন মজীদে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وَقَضَيْنَا الي بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا، فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُوْلاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُوْلِى بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلاَلَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلاً

অর্থ ঃ "আমরা কিতাবের মধ্যে বনি ইসরাইলকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, তোমরা যমীনে দুইবার বিশৃংখলা ও ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং বড় ধরনের বাড়াবাড়ি করবে। যখন ঐ দুই ফেতনার প্রথমটার সময়-কাল উপস্থিত হবে তখন আমরা তোমাদের উপর আমাদের এমন জঙ্গী শক্তিশালী লোককে বিজয়ী করবো, যারা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়বে। এটা এমন এক ওয়াদা ও ভবিষ্যদ্বাণী যা অবশ্যই সংঘটিত হবে।" (সূরা ইসরা ঃ ৪-৫)

১০. বন্দীদের প্রত্যাবর্তন ও মসজিদে আকসা পুনঃ নির্মাণ

ব্যাবিলনের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয়। কেননা, পারস্য সম্রাট কাওরাস এখমিনী যুদ্ধের মাধ্যমে ব্যাবিলন দখল করে নেন। ফলে ইয়াহুদা এবং ইসরাইল তার দখলে চলে আসে। কাওরাস বন্দীদেরকে ইয়াহুদায় পুনঃ

ফেরত পাঠান এবং তাদের ইহুদী ধর্ম পালনের সুযোগ দেন। তখন থেকে 'ইহুদী' শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি। সেজন্য বনি ইসরাইল হওয়া জরুরী নয়। ইহুদীরা ব্যাবিলন থেকে ফিরে আসার পর জেরুসালেম শহর এবং হাইকালে সুলাইমানী পুনঃনির্মাণ করে। কিন্তু জেরুসালেমে তাদের অবস্থা হল দেশবিহীন জাতির অবস্থা। কেননা, জেরুসালেম পারস্য সম্রাটের অধীন ছিল। যাই হোক, তখন ৪২ হাজার বনি ইসরাইল, আরো ৭ হাজার শিশু ও কুমারী মেয়ে সহকারে জেরুসালেম ফিরে আসে।

১১. জেরুসালেমে গ্রীক আক্রমণ

খৃস্টপূর্ব ৩২২ সালে মূর্তিপূজারী গ্রীকরা বাইতুল মাকদিস দখল করে। গ্রীক শাসক আলেকজান্ডার মাকদুনীর আদেশে ঐ আক্রমণ পরিচালিত হয়। তারা জেরুসালেমে পারস্য শাসনের অবসান করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসে কর্তৃত্ব করে। এরপর জেরুসালেমে বাতালিসা শাসনের সূচনা হয় এবং রোমান শাসনের আগ পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে।

১২. রোমানদের বাইতুল মাকদিস আক্রমণ

খৃস্টপূর্ব ২৩ সালে রোমান শাসক হিরোদ (Herod) জেরুসালেম দখল করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তিনি অবস্থা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেন। তিনি ইহুদীদের সাথে সমঝোতায় পৌছেন এবং খৃস্টপূর্ব ২০-১৮ সালে হাইকালে সুলাইমানী পুনঃনির্মাণ করার সুযোগ দেন। পরবর্তীতে হাইকালটি হযরত যাকারিয়া, তাঁর ছেলে হযরত ইয়াহইয়া এবং ঈসা বিন মরিয়ম পর্যন্ত ঐভাবেই বিদ্যমান ছিল।

১৩. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার (আ) যুগ

যাকারিয়া (আ) এর আমলে মসজিদে আকসা বর্তমান ছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, যখন ইমরানের স্ত্রী আল্লাহর কাছে একটি নেক সন্তান কামনা করে তাকে মসজিদে আকসার সেবার জন্য দান করার নিয়ত করেন, তখন আল্লাহ তাকে মরিয়ম নামক একটি মেয়ে সন্তান দান করেন। মরিয়মকে মসজিদে আকসায় দিয়ে দেয়া হয় এবং তিনি তাঁর নিকটাত্মীয় নিঃসন্তান হযরত যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠেন। হযরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন হাইকালের প্রধান। তিনি শিশু মরিয়মের জন্মে আশাবাদী হয়ে মসজিদে আকসার মেহরাবে নিজের জন্য আল্লাহর কাছে একটি নেক সন্তানের দোয়া

জানান। কঠোর বার্ধক্যে আল্লাহ তাঁকে একটি ছেলে সন্তান দান করেন। তাঁর নাম হচ্ছে ইয়াহইয়া (আ)। হযরত ইয়াহইয়া নবী ছিলেন।
ইহুদীরা হযরত যাকারিয়াকে (আ) করাত দিয়ে চিরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তারপর তারা হযরত ইয়াহইয়াকে (আ)ও হত্যা করেন।

১৪. হযরত ঈসা (আ) এর যুগ

কুমারী মরিয়মের ঘরে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়। যৌবনে পদার্পণ করার পর তিনি মসজিদে আকসাকে দাওয়াহ কেন্দ্র বানান। তাঁর সময় বনি ইসরাইল অগণিত অপরাধ করে। এমনকি, তারা মসজিদে আকসার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করে এবং একে সুদখোরদের বাজার ও খেল-তামাশার কেন্দ্রে পরিণত করে। ঈসা (আ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, তারা যদি এইভাবে নিজেদের অন্যায় ও অপরাধ অব্যাহত রাখে এবং মসজিদে আকসার পবিত্রতা নষ্ট করতে থাকে, তাহলে তাদেরকে এই মসজিদ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ এই মহান ইবাদতের স্থানটি ধ্বংস করে দেবেন এবং এর নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেবেন। খৃস্টানরা এটাকে গীর্জা হিসেবে ব্যবহার করে।

১৫. ২য় দফা ইবাদতগাহের ধ্বংস

হযরত যাকারিয়া এবং ইয়াহইয়া (আ) এই দুইজন নবীকে হত্যা করার পর বনি ইসরাইল ঈসা (আ)-কেও হত্যার উদ্যোগ নেয়। তখন আল্লাহ রোমান সম্রাট তাইতুসকে বনি ইসরাইলের উপর বিজয় দান করেন। ৬৬ খৃস্টাব্দে রোমান বাহিনীর সাথে বনি ইসরাইলের সংঘর্ষ শুরু হয় এবং তা দীর্ঘ ৫ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তখন ইহুদীদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করা হয়। ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমান বাহীন জেরুসালেম শহরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং অজস্র ইহুদীকে দাস বানিয়ে নিয়ে যায়। জেরুসালেম শহর ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় এবং কিছু সংখ্যক ইহুদী মিসর ও সিরিয়া পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

তাইতুস জেরুসালেম শহরের নাম পরিবর্তন করে 'ঈলিয়া' রাখেন। পরে সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে শহরের জেরুসালেম নাম পুনর্বহাল করেন। তখন হযরত ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পুরো সত্য প্রমাণিত হয় এবং জেরুসালেম শহর ও মসজিদে আকসা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। বখতে নসরের পর ২য় দফা মসজিদে আকসার বিনাশ সাধন করা হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ "তারপর ২য় বারের প্রতিশ্রুতির

সময় উপস্থিত হলে আমরা তোমাদের উপর অন্য লোকদেরকে বিজয়ী করবো, যেন তারা তোমাদেরকে মেরে চেহারা পরিবর্তন করে দেয়, প্রথমবারের মত তারাও যেন মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে এবং বিজিত লোকদের সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া।' (সূরা ইসরা ৪-৫)

আয়াতে বর্ণিত ২য় বারের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে হযরত ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকসা ও জেরুসালেমের ধ্বংস সাধন।

১৬. মসজিদে আকসার স্থানে মন্দির নির্মাণ

৭০ খৃস্টাব্দে তাইতুস কর্তৃক মসজিদে আকসা ধ্বংস হওয়ার পর আদরিয়াস নামক আরেক রোমান শাসকের আগমন ঘটে। তিনি জেরুসালেম শহরের সকল চিহ্ন এবং মসজিদে আকসার হাইকালের সকল ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলেন। ১৩৫ খস্টাব্দে তিনি মসজিদের স্থানে প্রতিমা পূজার জন্য মন্দির তৈরি করেন। মূর্তিপূজারী রোমানদের ঈশ্বর প্রভু 'গোয়েবতারে'র নামানুসারে এর নামকরণ করেন। দেবতা পূজার নামে তারা সেখানে শি্রক শুরু করে।

১৭. মন্দির বিধ্বংস

রোমানগণ খৃস্টধর্মকে স্বীকৃতি না দিয়েই 'গোয়েবতার' নামক মন্দির তৈরি করে। ফিলিস্তিনে খৃস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে। খৃষ্টস্টন ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। সম্রাট কনস্টান্টস্ট্যাইন মন্দির ধ্বংসের পর সেখানে খৃস্টান ধর্মের বিকৃতি সাধন করে ত্রিত্ববাদ চালু করেন। ফলে, মসজিদে আকসা থেকে এক আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় এবং শিরকী ত্রিত্ববাদের চর্চা চলতে থাকে।

১৮. জেরুসালেমে খৃস্টান গণহত্যা

৬১০ খৃস্টাব্দে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যে খৃস্টান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ক্ষমতায় আসেন। সেই সময় পারস্য সম্রাট ২য় খসরু খৃষ্টান শাসকদের কাছ থেকে সিরিয়া দখল করেন এবং ৬১৪ খৃস্টাব্দে জেরুসালেমে পৌঁছে তাও জয় করেন। তখন তিনি 'কেয়ামহা' গীর্জাসহ খৃস্টানদের সকল গীর্জা ধ্বংস করেন এবং জেরুসালেম শহরের ৯০ হাজার খৃস্টানকে হত্যা করেন। এতে করে খৃস্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দুর্বল হয়ে আসে।

কিন্তু, পরে হিরাক্লিয়াস দখলদার পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন এবং ৬২৯ খৃস্টাব্দে জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করেন।

এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْ اَدْنَى الاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ -

অর্থ ঃ 'নিকটবর্তী যমীনে রোম বাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তারা আবার জয়লাভ করবে।' (সূরা রূম-১)

হিরাক্লিয়াস জেরুসালেম থেকে পারস্য বাহিনী কর্তৃক ছিনিয়ে নেয়া ক্রুশসহ পুনরায় শহরে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ফিলিস্তিন বিজয়ী বিরাট বাহিনীও আনন্দ সহকারে জেরুসালেম শহরে প্রবেশ করে।

১৯. জেরুসালেমে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদের অবসান

হিরাক্লিয়াসের এই খুশীক্ষণে একজন আরব মুসলিম গিয়ে তাঁর কাছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পক্ষ থেকে একটি চিঠি হস্তান্তর করেন। চিঠিতে বলা হয়, চিঠিটি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর কাছ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হে হিরাক্লিয়াস! আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। নতুবা প্রজাসাধারণের সকল গুনাহর দায়-দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হবে। হে আহলে কিতাব! এমন একটি কালেমার বিষয়ে একমত হও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। আর সেটি হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুর ইবাদাত করবো না। তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবো না, এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে প্রতিপালক মানবো না।

হিরাক্লিয়াস ইসলাম কবুল করার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু দরবারের লোকদের বিরোধিতার কারণে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। (বুখারী)

মদীনায় হিজরাতের সামান্য আগে মসজিদে আকসায় মে'রাজের মাধ্যমে সেখানে ইসলামী যুগের সূচনা হয়। হিরাক্লিয়াস ৬৪১ খৃঃ পর্যন্ত জেরুসালেম শাসন করেন। তখন মসজিদে আকসার এলাকায় চার দেয়াল ছাড়া আর কিছু ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) যে দেয়ালের সাথে নিজ বোরাক বেঁধেছিলেন সেটাকে 'হায়েত আল-বোরাক' বা বোরাক দেয়াল বলা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সময় থেকেই জেরুসালেমের উপর ইহুদী ও খৃস্টানদের আধিপত্যের সমাপ্তির পয়গাম দেয়া হয়।

আল আকসা মসজিদের পরবর্তী ইতিহাস

১. রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ

আকাশে ওঠার জন্য সম্ভবতঃ মসজিদে আকসা ছাড়া আর কোন কেন্দ্র বা পথ নেই। তাই মে'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আকসার পথে উর্ধজগত ভ্রমণ করেছেন। মক্কা কিংবা মদীনাহ অথবা অন্য কোন স্থান থেকে সরাসরি উর্ধ- জগত ভ্রমণ করেননি। পূর্বে বর্ণিত এক হাদীসে জানা গেছে, সেখান থেকে হাশর-নশর হবে এবং লোকেরা বেহেশত ও দোযখে যাবে। মে'রাজে গিয়ে তিনি এসব জিনিস স্বচক্ষে দেখে এসেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মাকদিসকে শিরকমুক্ত করার জন্য রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামের দাওয়াত পাঠান। এরপর রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য তিন হাজার সাহাবী মুতা নামক স্থানে জড়ো হন। সেই যুদ্ধে তিনজন প্রখ্যাত সাহাবী শহীদ হন। তাঁরা হলেন, যায়েদ বিন হারিসা, জাফর বিন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। দুইপক্ষের মধ্যে কঠিন যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত খালিদ সাইফুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। এরপর রোম বাহিনী বাইতুল মাকদিসের উপর মুসলমানদের সাম্ভাব্য বিজয়ের আশংকায় মদীনার মুসলিম রাষ্ট্রটির উপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কেননা, রোমান সম্রাট বাইতুল মাকদিস-কেন্দ্রিক খৃস্টান বিশ্বের নেতৃত্ব হাতছাড়া করতে রাজী ছিল না। ৯ম হিজরীতে মুসলমানগণ খৃস্টানদের উক্ত আক্রমণের খবর পেয়ে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। মুসলিম বাহিনী তাবুক পর্যন্ত পৌছার পর খৃস্টানদের কোন যুদ্ধ তৎপরতা না দেখে পুনরায় মদীনায় ফিরে আসেন। আসলে, রোম বাহিনী মুসলমানদের খবর পেয়ে ভেগে পড়ে।

বিদায় হজ্জ থেকে মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়ায় রোমান বাহিনীর মূল দুর্গে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মুসমানদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিন। তিনি উসামা বিন যায়েদকে ঐ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তখন উসামা ১৮ বছরের যুবক। উসামার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে বের হন এবং জোরাফে যাত্রাবিরতি করেন। সেই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যু-পীড়ায় আক্রান্ত হন ও মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ইন্তিকাল করেন। মুসলিম বাহিনী সেখানে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকে।

২. হযরত আবু বাক্‌রের যুগ

রাসূলুল্লার (সা) ইন্তিকালের পর হযরত আবু বাক্‌র (রা) ইসলামের ১ম খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি উসামা বাহিনীর অগ্রযাত্রার নির্দেশ দেন। তিনি মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের উপর বিজয় লাভ করেন। উসামা বাহিনী প্রেরণের লক্ষ্য অর্জিত হয়। তারপর তিনি সিরিয়া জয় করে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১২ হাজার মুসলিম সেনার এক বিরাট বাহিনী গঠন করে খালিদ বিন ওয়ালিদকে এর আমীর নিযুক্ত করেন। সিরিয়ায় রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ঐ বাহিনীতে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম শরীক ছিলেন। ঐ অভিযানের ফলে ফিলিস্তিনের কয়েকটি শহর মুসলমানদের দখলে আসে। মূলতঃ হযরত আবু বাক্‌রের আমলেই জেরুসালেম জয়ের সূচনা হিসেবে ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী শহরগুলো মুসলমানদের দখলে আসে। জেরুসালেম জয় করার আগেই হযরত আবু বাক্‌রের (রা) ইন্তিকাল হয়।

৩. হযরত উমার ফারুকের যুগ

সিরিয়া জয়ের পর হযরত উমার ফারুক (রা) বাইতুল মাকদিস জয় করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি জেরুসালেম শহরে হযরত আবু ওবায়দাহ ইবন জাররাহর নেতৃত্বে ৫ হাজরে অশ্বারোহী সৈন্য পাঠান। তারপর ইয়াযিদ বিন আবী সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৫ হাজার এবং শোরাহবিল বিন হাসানাহর নেতৃত্বে আরো ৫ হাজার সৈন্য পাঠান। সম্মিলিত বাহিনী জেরুসালেম শহর অবরোধ করে এবং তা দীর্ঘ ৪ মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শহরবাসী লোকেরা প্রথম দিকে মোকাবিলা করলেও পরে পরাজিত হয় এবং সন্ধির প্রস্তাব দেয়। তারা খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত উমারের উপস্থিতি দাবী করে। আবু ওবায়দাহ হযরত উমারকে জেরুসালেম যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ১৮ হিজরীর রজব মাসে জেরুসালেম পৌছেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সা) মে'রাজেরও মাস। তিনি মোকাব্বের পাহাড়ের পথ দিয়ে জেরুসালেম পৌছেন। তাকবীর থেকে মোকাব্বের শব্দের উৎপত্তি। হযরত উমার তাকবীর দিতে দিতে শহরে পৌছার কারণে ঐ পাহাড়কে 'মোকাব্বের পাহাড়, বলা হয়। শহরে পৌছার পর পরই তিনি মসজিদে আকসা থেকে খৃস্টানদের সকল আবর্জনা ও অপবিত্রতা দূর করেন। তারা ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে সাখরায় ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করত। তিনি সাখরার সামনে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সাখরাকে মসজিদের পেছনে রাখেন। মসজিদ

তৈরির আগে তিনি কাব আহ্বারকে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় মসজিদ তৈরি করা যায়? কাব বলেন, সাখরাকে সামনে রেখে পেছনে মসজিদ তৈরি করুন। উমার (রা) বলেন, তা ইহুদীদের মতই হয়ে যায়। তাই তিনি সাখরার সামনেই মসজিদে তৈরি করেন। উল্লেখ্য যে, সেখানে মসজিদে আকসা নামে কোন মসজিদ ছিল না। বরং কুরআন 'মসজিদে আকসা' শব্দের উল্লেখ করায় একদিকে তা সেজদা ও ইবাদতের জায়গার প্রতি ইঙ্গিত এবং অন্যদিকে, অদূর ভবিষ্যতে নির্মিতব্য মসজিদের বিষয়ে ভষ্যিদ্বাণী করা হয়েছে। মসজিদে সাখরাকে মসজিদে উমারও বলা হয়।

৪. উমাইয়া শাসনামলে

উমাইয়া খলীফাহ আবদুল মালেক বিন মারওয়ান দামেস্কের সাথে সাথে জেরুসালেমেও খেলাফতের বাইয়াত নেন এবং জেরুসালেম শহর পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি ৬৮৫-৮৯ খৃঃ অর্থাৎ ৭৩ থেকে ৮৬ হিজরীর মধ্যে মসজিদে সাখরাকে সুন্দর করে পুনঃনির্মাণ করেন এবং নতুন করে মসজিদে আকসা তৈরির জন্য মসজিদে আকসার দেয়ালঘেরা সকল অংশ অন্তর্ভুক্ত করেন। আবদুল মালেক বিন মারওয়ান মসজিদে আকসার পুরো সীমানার উপর এই মসজিদ দুটি তৈরির উদ্যোগ নেন। তার ছেলে ওয়ালিদের আমলে মসজিদে আকসার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। উমাইয়া আমলেই মসজিদের মেহরাব ও মিনারা তৈরির প্রথা শুরু হয় এবং তারা মসজিদে আকসার মেহরাব ও মিনারা তৈরি করেন। শেষ পর্যন্ত ওয়ালিদ মসজিদের দেয়ালঘেরা অংশবিশেষের উপর মসজিদ দুটি তৈরি করেন।

আবদুল মালেক মসজিদে আকসা ও মসজিদে সাখরার পুনঃনির্মাণের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে মিসরের ৭ বছরের খাজনা নির্দিষ্ট করেন। উমাইয়া খলীফা উমার বিন আবদুল আযীয সকল অঞ্চলের গভর্নরদের প্রতি মসজিদে আকসা যেয়ারত এবং আনুগত্য ও লোকদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণের আহ্বান জানান।

৫. আব্বাসী শাসনামলে

১৩২ হিঃ থেকে ৬৫৬ পর্যন্ত আব্বাসী শাসকরা মসজিদে আকসার সংরক্ষণ ও সেবা আঞ্জাম দেন। একবার ভূমিকম্পে মসজিদের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আব্বাসীয় খলীফা আবু জাফর মনসুর তাঁর সাম্রাজ্যের সকল গভর্নরদের প্রতি মসজিদের একটি একটি অংশ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। ফলে, মসজিদকে

আগের চাইতেও আরো বেশী মজবুত করে নির্মাণ করা হয়। ১৫৮ হিজরীতে খলীফা মাহদী মসজিদে আকসার সংস্কার করেন এবং মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। পরে আব্বাসী খলীফা মামুনও মসজিদের অনুরূপ সংস্কারও সম্প্রসারণ করেন।

৬. তুলুন, এখশিদিন ও ফাতেমী শাসনামলে

তুলুন ও এখশিদিন শাসনামলে মসজিদে আকসার প্রয়োজনীয় সেবা অব্যাহত থাকে। তারপর জেরুসালেম ফাতেমী শাসক মোয়েজ লি-দিনিল্লার সময় ওবায়দীর শাসনে আসে। ৯৬৯ হিঃ তাঁর প্রধান সেনাপতি জাওহার আস সাকাল্লি ফিলিস্তিন দখল করেন। ফাতেমী শাসকেরা বাহ্যতঃ শিয়া মাজহাবের অনুসারী ছিল। কিন্তু তারা ফিলিস্তিনে ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে নিকটতর করার চেষ্টা চালায়। তারা ইহুদী-খৃস্টানদের সাথে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বাইজানটাইনের খৃস্টান শাসকের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এর ফলে, জেরুসালেমে খৃস্টানদের বসবাস শুরু হয়।

৭. সেলজুকী শাসনামলে

সেলজুকী শাসকরা কিছুদিন পর্যন্ত জেরুসালেম শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। তারা তাদের শত্রু ফাতেমী শাসকদের কবজা থেকে ৪৬৫ হিজরী, মোতাবেক ১০৭১ খৃঃ জেরুসালেম শহর দখল করে। পরবর্তীতে ফাতেমী শাসকরা সেলজুকীদের কাছ থেকে জেরুসালেম শহর পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ফাতেমীদের খৃস্টান-প্রীতির কারণে শেষ পর্যন্ত খৃস্টানরা তাদের কাছ থেকে জেরুসালেম শহর দখল করে নেয়।

৮. খৃস্টান ক্রুসেডারদের হাতে জেরুসালেমের পতন ও মুসলিম নিধন

জেরুসালেম শহর ১০৯৯ খৃঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫শ' বছর মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু ফাতেমীদের বিরুদ্ধে জেরুসালেমের খৃস্টান পাদ্রী ২য় সোমআন খৃস্টান বিশ্বের প্রতি সাহায্যের আহ্বান জানান। ১০৯৫ খৃঃ পোপ খৃস্টান বিশ্বের প্রতি পবিত্র জেরুসালেম শহর উদ্ধারের উদ্দেশ্যে মুসলমানেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেডের ডাক) দেন। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো পোপের আহ্বানে সাড়া দেয়। কেননা, মুসলমানদের হাতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর খৃস্টান বিশ্ব পুনরায় প্রাচ্যে তাদের নতুন সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখছিল।

১০৯৯ খৃস্টাব্দের ১৫ই জুলাই, মোতাবেক ২৩শে শাবান ৪৯২ হিঃ, খৃস্টান সেনাপতি গডফ্রে ডিবো ইউনের নেতৃত্বে ক্রুসেড বাহিনী জেরুসালেমের বাব-আস সাহেরা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং ৪০ দিন পর্যন্ত শহর অবরোধ করে রাখে। শিয়া নেতা ইফতেখারুদ্দৌলা তার বাহিনীসহ পালিয়ে যায় এবং ফাতেমীয় খলীফা মোস্তালী বিল্লাহ ও মোসতাজহের বিল্লার শাসনামলে খৃস্টানদের হাতে জেরুসালেম শহরের পতন ঘটে। খৃস্টান ক্রুসেডারগণ প্রচণ্ড উন্মত্ততা সহকারে জেরুসালেমে প্রবেশ করে এবং জনগণের মধ্যে বিরাট ত্রাসের সৃষ্টি করে। তারা পাশবিক অত্যাচার-নির্যাতনে মেতে ওঠে এবং যাকে সামনে পায় তাকেই নির্বিচারে হত্যা করে। তাদের হাত থেকে বৃদ্ধ-যুবক এবং শিশু-নারী কেউ রক্ষা পায়নি। গোটা শহরে তারা পাইকারী মুসলিম হত্যা চালায় ও রক্তের বন্যা প্রবাহিত করে। পরের দিন সকালে তারা মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে এবং মসজিদের মুসল্লী ও নেক লোদের রক্তে মসজিদের আঙিনা রঞ্জিত করে তোলে। ক্রুসেডারদের সেনাধ্যক্ষ রেমন্ড দুপুরের সূর্য হেলার আগে এক হাঁটু রক্ত ও লাশের উপর দিয়ে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে। তিনদিন ব্যাপী তারা মুসলিম হত্যাকাণ্ড চালায় এবং ৯০ হাজার মুসলমান হত্যা করে।

তারা মসজিদে সাখরাকে গীর্জায় রূপান্তরিত করে। মসজিদের এক অংশকে ঘোড়ার আঁস্তাবল বানায় এবং অন্য অংশে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করে।

১৭ই জুলাই তারা রাস্তা থেকে মুসলমানদের লাশ সরানোর কাজ শুরু করে এবং মিসরের সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণের প্রহর গুনতে থাকে। এইভাবে খৃস্টান শাসকরা দীর্ঘ ৯১ বছর পর্যন্ত জেরুসালেম শহর শাসন করে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত করে।

৯. হিত্তিনের যুদ্ধে জেরুসালেম পুনরুদ্ধার

১১৭১ খৃঃ মোতাবেক ৫৬৭ হিজরীতে, মিসরের সুলতান সালাহউদ্দীন ইউসুফ বিন আইউব খৃস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং সিরিয়ার উদ্দেশ্যে ১১৭৭ খৃঃ মিসরের আরীস ত্যাগ করে। সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পর তিনি ১১৮৭ খৃস্টাব্দে জেরুসালেম দখলের লক্ষ্যে হিত্তিনের ময়দানে পৌছেন এবং খৃস্টান বাহিনীর ১ লাখ ৬৩ হাজার অশ্বারোহীকে পরাজিত করেন। মুসলমানদের পেছনে ছিল জর্দান নদী আর সামনে ছিল শত্রুবাহিনী। মুসলিম বাহিনী জেরুসালেমের খৃস্টান রাজাকে

আটক করে এবং যুদ্ধে ৩০ হাজার খৃস্টান সৈন্যকে হত্যা ও অন্য ৩০ হাজারকে আটক করে। সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ৫৮৩ হিজরীর ২৭শে রজব শুক্রবার মোতাবেক ১২ই অক্টোবর ১১৮৭ খৃঃ, জেরুসালেম শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহর (সা) মে'রাজের দিবসের সাথে বিজয় দিবস একাকার হয়ে গেল। তিনি প্রথম শুক্রবার মসজিদে সাখরায় জুমার নামায পড়তে পারেননি। কেননা, তাতে খৃস্টানদের টয়লেট, ঘর ও ময়লা-আবর্জনা ছিল। তিনি নিজ হাতে সেগুলো ঝাড়ু দেন ও পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে। ৫৮৩ হিঃ ৪ঠা শাবান, ২য় শুক্রবার, তিনি তাতে জুমার নামায আদায় করেন।

সালাহউদ্দীন জেরুসালেমের খৃস্টান নাগরিকদের প্রতি ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং তাদের দুশমনীর কোন বিচার করেননি। খৃস্টানদের বিজয় ও মুসলমানদের বিজয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ফুটে ওঠে।

সালাহউদ্দীন জেরুসালেম শহর পুনঃনির্মাণ করেন। মসজিদে আকসায় একটা মিম্বার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মসজিদের সম্প্রসারণ করেন এবং মসজিদের কারুকার্য আরো বৃদ্ধি করেন। এছাড়াও তিনি মসজিদে কিতাব ও কুরআনের ব্যবস্থা করেন। তিনি মসজিদে আকসার বাইরে অবস্থিত মেহরাবে দাউদের জন্য ২ জন ইমাম, ২ জন মুয়ায্যিন ও একজন মোতাওয়াল্লী নির্ধারণ করেন। এটি একটি উঁচু স্থানে সুরক্ষিত ছিল। মেহরাবে দাউদ শহরের প্রবেশ পথে বিদ্যমান ছিল।

১০. তাতারী আক্রমণ ও দ্বিতীয় ক্রুসেড

৬৫৮ হিজরীর ৪ঠা সফর, তাতারের নেতা হালাকু খাঁর হাতে বাগদাদের ইসলামী খেলাফতের পতন ঘটে। তাতারীরা গোটা ইরাক ও সিরিয়া দখল করার পর মিসর অভিযানের উদ্যোগ নেয়। তাতারীরা দুর্ধর্ষ জালেম ও বর্বর। যে শহরেই তারা ঢুকেছে সে শহরের সকল কিছু ধ্বংস ও সেখানকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করেছে। মিসরীয় বাহিনী তাতারীদের মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে আসে এবং ফিলিস্তিনের নাবলুস ও সিরিয়ার বিসানের মাঝে অবস্থিত 'আইনে জালুত' নামক স্থানে ৬৫৮ হিজরীর ২৫শে রমজান, মোতাবেক ১২৬২ খৃঃ তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৪ হাজার মিসরীয় মুসলিম সেনার হাতে ১ লাখ তাতারী সেনা পরাজিত হয়। মিসরের জাহের বাইবারসের বাহিনী সেদিন ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দেয় এবং মিসরের সুলতান কোত্জের

ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে। জাহের বাইবারস জেরুসালেমের উপর তাতারী আক্রমণ প্রতিহত করে মসজিদে আকসার হেফাজত করেন এবং পরবর্তীতে মসজিদের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ করেন।

মিসরের শাসকরা ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দীনের বংশধর। পারিবারিক কোন্দলের কারণে তাদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ৭২৫ হিজরী মোতাবেক ১৩২৯ খৃঃ খৃস্টান ক্রুসেডারদের হাতে পুনরায় জেরুসালেমের পতন হয়। ১৭শ খৃস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি, তুরস্কের ওসমানী সুলতান ১ম সেলিমের হাতে জেরুসালেম পুনরুদ্ধার হয় এবং ১৯২২ খৃঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর বৃটেনের অসিগিরীতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তা মুসলমানদের শাসনাধীন থাকে।

১১. ওসমানী শাসনামলে

১৫২০ খৃঃ থেকে ১৫৬০ খৃঃ পর্যন্ত তুর্কী সুলতান সুলাইমান কানুনী মসজিদে আকসার চার দেয়াল সংস্কার করেন। মসজিদের পার্শ্বে অবস্থিত দুর্গ, কূপ ও হারাম শরীফের দরজা ও দেয়াল পুনঃনির্মাণ করেন এবং মাকামে দাউদ সংস্কার করেন। ওসমানী শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা জেরুসালেমের প্রতি শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তুর্কী সুলতান জার্মানীর পক্ষে এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। ফলে বিজয়ী বৃটেন তুর্কী শাসনের অবসান ঘটায় এবং জেরুসালেম দখল করে নেয়। পাঁচ বছর পর ১৯২২ খৃঃ জাতিসংঘ জেরুসালেমের উপর বৃটেনকে ম্যান্ডেট দেয় এবং বৃটেন জেরুসালেমের উপর অসি নিযুক্ত হয়। তখন জেরুসালেমে মুসলিম শাসনের অবসান হয়।

১২. বৃটিশ শাসনামলে

২রা নবেম্বর, ১৯১৭ খৃঃ, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর কুখ্যাত 'বেলফোর ঘোষণায়' ইহুদী নেতা লর্ড রথচাইল্ডকে জানান যে, বৃটেন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। ১৯২২ খৃঃ জাতিসংঘ ফিলিস্তিনে পৃথক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে। ১৯২২ খৃঃ থেকে ১৯৬৭ খৃঃ পর্যন্ত বিশ্ব ইহুদী সংস্থা বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে এনে পুনর্বাসন করে। জার্মানীর নাৎসী নির্যাতনের ফলে বহু ইহুদী ফিলিস্তিনে চলে আসে। ১৯৪৭ খৃঃ জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে ২ ভাগ করে একভাগে আরব রাষ্ট্র এবং অন্যভাগে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের

১৫ই মে বৃটেন ফিলিস্তিন এবং জেরুসালেম থেকে নিজ শাসনের অবসান এবং পৃথক ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

বৃটেন, ১৯৪৮ সালের ২৬শে মে গাজ্জাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিসরের কাছে এবং ১৯শে মে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও জেরুসালেমকে জর্দানের কাছে হস্তান্তর করে।

১৩. জর্দানের মুসলিম শাসনামলে

দীর্ঘ ৩১ বছর বৃটিশ শাসনে থাকার পর জেরুসালেম পুনরায় জর্দানের আরব মুসলমানদের শাসনে ফিরে আসে। জেরুসালেম ১৯৬৭ খৃঃ পর্যন্ত জর্দানী শাসনাধীন থাকে।

১৪. ইসরাইলী শাসনামলে

১৯৬৭ খৃঃ জুন মাসে ইসরাইল একযোগে মিসর, সিরিয়া এবং জর্দানের উপর আক্রমণ করে। ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরাইল, জর্দানের মুসলিম শাসন থেকে জেরুসালেম দখল করে নেয়। এছাড়া ইসরাইল মিসরের সিনাই উপত্যকা এবং সিরিয়ার গোলান হাইট দখল করে। এরপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২ নং প্রস্তাব গ্রহণ করে এতদঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি এবং অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরাইলী বাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। কিন্তু সেই প্রস্তাব আজও কার্যকর হয়নি। তাই জেরুসালেম এখন পর্যন্ত ইসরাইলী জবরদখলে রয়েছে। ইসরাইল জেরুসালেমকে তার স্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করে বলেছে, সে কখনও জেরুসালেম হাতছাড়া করবে না।

এখন মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন চলছে। বিশ্বের দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ সম্মেলন আহ্বান করেছে। সম্মেলনের লক্ষ্য হল, ফিলিস্তিন সমস্যাসহ মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান করা এবং অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরাইলী জবরদখলের অবসান ঘটানো।

লক্ষণীয় বিষয়

জেরুসালেম বিগত ১৪শ' বছরের মধ্যে প্রায় ১ হাজার বছর যাবত মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। মাত্র ২বার খৃস্টান শাসন ও সর্বশেষবার ইহুদী শাসনের যাঁতাকলে ঐ মুসলিম শহরটি নিষ্পেষিত হয়। আজ দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত জেরুসালেম ইসরাইলের জবরদখলে রয়েছে। ইসরাইলের মাত্র ৫০ লাখ ইহুদীর কাছে আজ জেরুসালেম বন্দী। পক্ষান্তরে, ইসরাইলের পার্শ্ববর্তী আরব দেশসমূহের মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে ১৭ কোটি এবং গোটা দুনিয়ায়

মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে ১শ' কোটি।

আজ মুসলমানদের এই অসহায়ত্ব দূর করার জন্য জেরুসালেম বিজয়ী আবু ওবায়দাহ বিন জাররাহ ও সালাহউদ্দীন আইউবীর মত নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব দরকার।

মসজিদে আকসার ভূমিকা

মসজিদে আকসা ইসলামের সুমহান নেতৃস্থানীয় মসজিদসমূহের অন্যতম। অতীতে এই মসজিদ বহুমুখী ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে মসজিদটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক পুনঃনির্মাণের পর হাজার হাজার বছর ধরে এটি ছিল বহুসংখ্যক আম্বিয়ায়ে কেরামের দীনি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র। তদানীন্তন যুগের জন্য এটি ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র, যাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন নবী ও বাদশাহরা এখান থেকেই জেরুসালেম-ভিত্তিক রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

মসজিদে আকসা মূলতঃ সভ্যতা ও তমদ্দুনের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনন্য প্রতীক। এটি ইসলামী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ধারক।

মসজিদে আকসায় ইসলামী শিক্ষাদান করা হত এবং তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বরং এর চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা ও লাইব্রেরী। অর্থাৎ সেখানে রয়েছে দারুল কুরআন, দারুল হাদীস ও বোর্ডিং। সেগুলোতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট পর্যায়ে শিক্ষাদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও তাতে আরবী ভাষা, ইসলামী আইন, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়।

মোটকথা, মসজিদে আকসায় দীনি শিক্ষার সাথে সাথে ইতিহাস, অংক, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনসহ অন্যান্য দুনিয়াবী বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হত।

উলামায়ে কেরাম, বিচারকমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মসজিদে আকসায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করতেন।

এই মসজিদ থেকেই তদানীন্তন শাসকরা জনগণের উদ্দেশ্যে সরকারী পয়গাম ও বক্তৃতা বিবৃতি প্রকাশ করতেন। সেগুলো সেখানে পাঠ করার পর তা জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক করা হত।

মসজিদে আকসার ভেতর অবস্থিত বিভিন্ন মাদ্রসায় বহু প্রখ্যাত আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাদের মধ্যে মাদ্রাসা

নাসারিয়ায় শেখ আবুল ফাতহ নাসার বিন ইবরাহীম আল-মাকদেসী অন্যতম। ইমাম গাজালী এবং আবু বাক্‌র বিন আল-আরাবী তাঁর সাথে সেখানে সাক্ষাত করেন।

পরবর্তীতে ইমাম গাজালী মসজিদে আকসায় বসে একটি বই লেখন। বইটির নাম হচ্ছে, 'আর-রিসালাতুল কুদসিয়াহ্ ফি কওয়ায়েদিল আকায়েদ'। এ বিষয়টি তিনি 'এহইয়াউলুমিদ্দিন' বইতে উল্লেখ করেছেন।

আজ মসজিদে আকসা ইসরাইলের ইহুদীদের জবরদখলে রয়েছে। তাই সেখানে মসজিদের পূর্বের ভূমিকা এখন আর নেই। মসজিদ ইহুদীদের জবরদখল থেকে মুক্তি লাভ করার পর আবার তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম

১৯৪৮ খৃঃ ১৫ই মে মুসলিম ফিলিস্তিনে বিষফোঁড়া ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ইহুদীরা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল এবং তাদের কোন সুনির্দিষ্ট জাতীয় বাসস্থান বা দেশ ছিল না। যে দেশে তারা বাস করতো, তারা সেই দেশেরই নাগরিক ছিল।

কিন্তু ১৮৯৭ খৃঃ ইহুদী নেতা ও দার্শনিক থিওডোর হার্জ্জল এক আন্তর্জাতিক ইহুদী সম্মেলন আহ্বান করেন। তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫০ জন ইহুদী পণ্ডিত, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ অংশ নেন। সুইজারল্যান্ডের বেসলে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে ইহুদীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইহুদীরা ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মাধ্যমে প্রথমে সাইপ্রাস, ল্যাটিন আমেরিকা, উগান্ডা কিংবা দক্ষিণ সুদানে একটি ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে তারা সফল হতে না পেরে পরে ১৯০৫ খৃঃ বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেসের ২য় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মুতাবিক ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়। তারা প্রথমে তুর্কি সুলতানের অধীন ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান আবদুল হামিদের কাছে ভূমি কেনার প্রস্তাব করে। কিন্তু সুলতান আবদুল হামিদ এক বিঘত জায়গা দিতেও অস্বীকার করায় তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে।

বৃটেন ছিল তদানীন্তন পরাশক্তি। তখন ইহুদীরা সূর্যদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারস্থ হয়। বৃটেন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

ওয়াইজম্যান তার স্মারকে উল্লেখ করেছেন, বেলফোর ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টান। তিনি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-তাওরাতে বিশ্বাসী ছিলেন।তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইহুদীরা পুনরায় ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহর কাছে এর উত্তম বিনিময়ের আশা করেছিলেন।

২য় বিশ্ব যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তখন বৃটিশ শক্তি ভংগুর অবস্থার শিকার। তাই ইহুদীরা তাদের কেন্দ্র বৃটেন থেকে আমেরিকায় পরিবর্তন করে এবং মার্কিন প্রশাসন, প্রচারযন্ত্র অর্থনীতির

উপর প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে। ক্রমান্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর ইহুদীরাও মার্কিন ঘাড়ে সওয়ার হয়ে. বসে এবং মার্কিন কংগ্রেস সিনেট ও হোয়াইট-হাউজের প্রশাসনে জ্বিনের মত প্রভাব বিস্তার করে। তারা নিজেদের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে সকল কাজ আদায় করে নেয় এবং ইহুদীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোন চিন্তা ও পরিকল্পনা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বহু দূরে রাখে। এমন কি ইহুদীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রচার মাধ্যমের সমর্থন ছাড়া কোন দল বা ব্যক্তির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে কিংবা সিনেটের নির্বাচনে জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ইসরাইল নামক এই বিষাক্ত সাপটিকে যুক্তরাষ্ট্র দুধ-কলা দিয়ে পুষে যাচ্ছে। ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে যে কোন অন্যায় করে বসতে পারে এবং দুনিয়ার আন্তর্জাতিক মতামতকে উপেক্ষা করতে পারে। এখনও আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থা বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলোকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তারা ঐ সকল দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রচারমাধ্যম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও চীনে তাদের এই অপচেষ্টা অব্যাহত আছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বেখবর ও উদাসীন।

ইহুদী জাতি

ইহুদীবাদ হচ্ছে হিব্রুদের ধর্ম। হযরত ইয়াকুবের বংশদরদের পরবর্তীতে বনি ইসরাইল বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। বনি ইসরাইল পরবর্তীতে ইহুদী জাতি নামে পরিচিত হয়। 'ইয়াহুদা' নামক রাষ্ট্রের নামানুসারে বনি ইসরাইল 'ইহুদী' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ব্যাবিলনের শাসক বখতে নসর জেরুসালেম, হাইকালে সুলাইমানী এবং তাওরাত ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে, ইহুদীরা ব্যাবিলনের উপর বিজয় লাভকারী পারস্য সম্রাট আরতাখসাসনার কাছে ওজাইরের নেতৃত্বে ব্যাবিলনে বন্দী ইহুদীদেরকে জেরুসালেম ফেরত পাঠানোর আবেদন জানায়।

মূল তাওরাত ধ্বংস হওয়ার পর ওজাইর ব্যাবিলনে বসে তাওরাত পুনরায় লিপিবদ্ধ করেন। ফলে, মূল তাওরাত আর সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ব্যাবিলনের কিসসা-কাহিনী ও কিংবদন্ত তাওরাতের মূলন্ত প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

গোস্তাব লোভন তাঁর *'প্রাথমিক সভ্যতায় ইহুদী'* নামক বইতে লিখেছেন, পবিত্র তাওরাত গ্রন্থের কাহিনীসমূহ কালদানী কিংবদন্তী থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এগুলো ইতিপূর্বে আশুরীয় গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ ছিল। কালদানী কাহিনীগুলো কখনও বাস্তবে সংঘটিত হয়নি। এগুলো হচ্ছে কাল্পনিক। কিন্তু পরবর্তীতে ইসরাইলীরা সেই কাল্পনিক ঘটনাগুলোকে সত্য বলে মনে করতে থাকে। এর মধ্যে শামসুন হিরক্লিয়াস ইহুদীর কাহিনী অন্যতম।[২৭]

ওজাইর মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী ইহুদীদেরসহ পুনঃলিপিবদ্ধ তাওরাত নিয়ে জেরুসালেম ফিরে আসেন। মূসা (আ)-এর পর ধ্বংসকৃত তাওরাত পুনঃ লিপিবদ্ধ করায় এবং জেরুসালেমে পুনরায় হাইকাল নির্মাণ করার কারণে ইহুদরীরা তাঁকে 'আল্লাহর ছেলে' বলে অভিহিত করে। তারা তাকে আজরা বলে ডাকে। তিনি একজন নেকলোক ছিলেন।

ইহুদীদের ধর্মীয় চিন্তাধারা

আল্লাহকে মা'বুদ মানা সত্ত্বেও তারা গো-বাছুরের পূজা করে। তারা তামার তৈরি সাপকেও পবিত্র মনে করে এবং প্রাচীন ইহুদীরা তার পূজা করত। কেননা, হযরত মূসার হাতের লাঠি আল্লাহর কুদরতে সাপ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মা'বুদের নাম হচ্ছে 'ইয়াহওয়া' বা যিহোভা। সেই ইলাহ ভুল-ভ্রান্তি করে এবং লজ্জিত হয়। তিনি শুধু বনি ইসরাইলের ইলাহ, অন্যদের নয়।

ইহুদীরা মূলত তাওহীদপন্থী ও এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। কিন্তু তাওরাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ওজাইর তা লোকদের কাছে শুনে শুনে পুনরায় লিপিবদ্ধ করায় তারা তাকে আল্লাহর সন্তান বলে অভিহিত করে শির্কে লিপ্ত হয়। তাদের মতে, ইবরাহীম (আ) ইসমাঈলকে নয়, ইসহাককেই জবেহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

তাদের ধর্মে পুনরুত্থান, অনন্ত জীবন, সওয়াব ও শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন বক্তব্য নেই। তাদের মতে, শাস্তি ও পুরস্কার এই দুনিয়াতেই হবে। সওয়াব হচ্ছে বিজয় এবং শাস্তি হচ্ছে লোকসান, অপমান ও গোলামী।

শনিবার মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় আল্লাহ সংশ্লিষ্ট পাপীদেরকে বানর বানিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাদের একটি পবিত্র বাক্স আছে, তাতে আগে মহামূল্যবান জিনিস, দলীল ও পবিত্র কিতাব হেফাজত করা হত।

---

২৭. উরুশ লিম-কাতিলাতুল আম্বিয়া, মাহমুদ শারকাওয়ী।

হযরত সুলাইমান (আ) ইবাদতের উদ্দেশ্যে যে ঘর তৈরি করেছেন, তা তাদের কাছে পবিত্র এবং এটাকে তারা হাইকালে সুলাইমানী বলে। ইহুদীরা মনে করে, তারা আল্লাহর নির্বাচিত মনোনীত বিশেষ জাতি। ইহুদীদের রূহ আল্লাহর রূহের অংশ বিশেষ। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, ইহুদী ও অ-ইহুদীর পার্থক্য। অর্থাৎ ইহুদীরা মানুষ, আর অন্যরা পশু সমতুল্য।

ইহুদী জাতির পক্ষে অন্য জাতির সম্পদ চুরি-ডাকাতি করা ও তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হারে সুদ খাওয়া বৈধ। তাই তারা বিশ্বব্যাপী সুদী কারবারে লিপ্ত। তারা অন্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে এবং অ-ইহুদীদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে বাধ্য নয়। কেননা, অইহুদীরা হচ্ছে কুকুর, শুকর ও পশুর মত। তাদের সাথে নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ তালমুদের বক্তব্য হল, খৃস্টান ঈসা দোজখের আগুন ও গ্যাসের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাঁর মা মরিয়ম বান্দারা নামক জনৈক সৈনিকের দ্বারা গর্ভধারণ করে ঈসাকে অবৈধভাবে জন্ম দিয়েছে। তাই খৃস্টানদের গীর্জা আবর্জনা সমতুল্য এবং তাদের ধর্মীয় বক্তারা হচ্ছে ঘেউ ঘেউকারী কুকুর।

তাদের মতে, ইয়াকুব (আ) আল্লাহর সাথে ধস্তাধস্তি করেছিলেন এবং লূত (আ) মদপান করেছিলেন ও নিজের দুই কন্যার সাথে যেনা করেছিলেন। এছাড়াও আল্লাহর কাছে দাউদ (আ) ছিলেন মন্দ ব্যক্তি। (নাউজুবিল্লাহ)

বিয়ের পরে স্ত্রীকে স্বামীর মালিকানাধীন বিবেচনা করা হয় এবং স্ত্রীর সকল সম্পদের উপর স্বামীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরে তা নিয়ে বহু বিতর্কের পর ঠিক হয় যে, স্ত্রী সম্পদের মালিকানা লাভ করবে বটে, তবে লাভের মালিকানা থাকবে স্বামীর।

বিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর বিয়ে না করলে অভিশাপের যোগ্য হয়। ইহুদী ধর্মে একাধিক বিয়ে বৈধ এবং তাতে কোন সীমিত সংখ্যা নেই। তবে তাদের মধ্যে সূফীবাদীরা ৪ স্ত্রী পর্যন্ত সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে দিলেও অন্যরা ঐ সংখ্যা সীমাহীন রেখেছে।

ইহুদীদের মধ্যে ৮টি দল রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. চরমপন্থী বা কট্টরপন্থী ঃ তারা মূলত ঃ সূফী ও চিরকুমার।

২. সেদকী ঃ তারা পুনরুত্থান, মিজান, বেহেশত-দোজখ, ফেরেশতা, ঈসা ও তালমুদকে অস্বীকার করে।

৩. সাম্প্রদায়িক ঃ তারা কট্টরপন্থীদের অনুরূপ ও ক্ষমার বিরোধী।

৪. ইহুদী ওয়ায়েজ বা বক্তা ঃ তারা ওয়াজ-নসীহতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

৫. কোরআউন ঃ তারা তাওরাত ছাড়া অন্য কোন কিছু গ্রহণ করে না এবং তালমুদকেও অস্বীকার করে।

৬. সামেরী সম্প্রদায় ঃ তারা মূসা, হারুন এবং ইউশা বিন নূনকে ছাড়া আর কাউকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না।

৭. সাবাঈ দল ঃ তারা আবদুল্লাহ বিন সাবার অনুসারী। আবদুল্লাহ বিন সাবা ইসলামকে আভ্যন্তরীণ দিক থেকে ধ্বংস করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করে। যার ফলে, হযরত উসমানকে শহীদ এবং ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করা সহজ হয়।

৮. হাখাম ঃ তারা হচ্ছে সর্বোচ্চ ইহুদী আলেম। তারা ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

অবিকৃত তাওরাতের অনুসারী সঠিক হিব্রু ইহুদীর কোন অস্তিত্ব কোথাও নেই। বিকৃত তাওরাতের অনুসারী হিসেবে তাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসও বিকৃত রুচিসম্পন্ন।

ইহুদীদের ধর্মীয় দিবসের মধ্যে রয়েছে ১৪-১২ এপ্রিল, ফেরাউনের যুগে মিসর থেকে বনি ইসরাইলের মুক্তি সপ্তাহ পালন। সেদিন মদবিহীন রুটি খেতে হয়।

ক্ষমা দিবস ঃ ইহুদী সালের ১০ম মাসের প্রথম ৯ দিন রোযা, ইবাদত ও তাওবাহ করার পর ১০ম দিবস হচ্ছে, ক্ষমা দিবস। সেদিন খানা-পিনা বন্ধ রেখে পুরো দিন ইবাদতে কাটিয়ে দিতে হবে। ফলে, অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং এভাবে নতুন বছরকে স্বাগতম জানানো হয়।

প্রতিবছর প্রত্যেক ইহুদীকে ২ বার বাইতুল মাকদিস যেয়ারতে যেতে হবে। এবং এটা অত্যন্ত জরুরী।

প্রত্যেক চান্দ্রমাসের নতুন চাঁদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করা। তারা বাইতুল মাকদিসে বিউগল বাজিয়ে এবং আগুন জ্বালিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে।

শনিবার দিন ছুটির দিন। সেদিন কোন কাজ করা যাবে না। তাদের মতে, আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর শানিবার দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তিনি

নিজ আরশে পিঠের উপর শুয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে বিশ্রাম করেন।[২৮]

ইহুদী চরিত্র

ইহুদীদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলার জন্য তাদের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী জানা প্রয়োজন। আল্লাহ কুরআনে ইহুদীদের ঐ সকল গুণাবলী তুলে ধরেছেন। এখন আমরা কুরআনে বর্ণিত ইহুদী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. কাপুরুষতা ঃ ইহুদীরা ভীরু ও কাপুরুষ। আল্লাহ বলেন ঃ

لاَيُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلاَّ فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ

অর্থ ঃ 'তারা সবাই মিলেও তোমাদের সাথে লড়াই করবে না হাঁ, সুরক্ষিত জনপদ কিংবা দুর্গের দেয়ালের আড় থেকেই লড়াই করার সাহস করবে'। (সূরা হাশর-১৪) তাই বীরত্ব সম্পর্কে ইহুদী দাবী মুসলমানদের কাছে অর্থহীন।

২. চুক্তি ভঙ্গ করা ঃ ইহুদীরা সর্বদা নবী-রাসূল এবং আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এখন তারা যে কোন চুক্তি ও সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করতে কণ্ঠবোধ করে না। স্বার্থপরতা তাদের বৈশিষ্ট্য। তাই তারা জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবাবলী প্রত্যাখ্যান করে চলছে। আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

অর্থ ঃ 'তাদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে গোমরাহীর সীল মেরে দিয়েছেন'। (সূরা নিসা)

৩. পাশবিকতা ঃ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর প্রিয় নবীদেরকে হত্যা করার জঘন্য তৎপরতা চালিয়ে তারা প্রমাণ করেছে, তাদের স্বার্থের পরিপন্থী যে কোন লোককে হত্যা করা সম্ভব। তারা ২ জন নবীকে হত্যা করেছে এবং আরেকজনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়। তাদের এই পৈশাচিক মনোভাব এখনও বিদ্যমান।

---

২৮. আল-মাওসুআতুল মুইয়াস্‌সারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাজাহেব আল-মুয়াসেরা, প্রকাশক WAMY, রিয়াদ, প্রকাশকাল : ১৯৮৯।

৪. অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি ঃ ইহুদীরা পৃথিবীর দেশে দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করে। মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে ঢুকে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যায় নিক্ষেপ করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা চালায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَأَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

অর্থ ঃ 'যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা যমীনে ফেতনা-ফাসাদ ও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। আল্লাহ্ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।' (আল মায়িদা)

৫. অন্য ধর্মের প্রতি অসহনশীলতা ঃ তারা যেহেতু নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর নির্বাচিত উত্তম মানুষ বলে মনে করে, সেহেতু অন্য ধর্ম ও আদর্শের প্রতি তাদের অসহনশীলতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ বলেন,

لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصَارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

অর্থঃ 'ইহুদী ও খৃস্টানরা সে পর্যন্ত আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্ম ও মিল্লাতের অনুসরণ করেন'।

৬. মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ঃ ইহুদীরা মুসলমানদের সর্বপ্রধান শত্রু মনে করে। পক্ষান্তরে, অন্যদের সাথে তাদের কিছুটা মিত্রতা গড়ে ওঠে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ امَنُوْا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

অর্থ ঃ 'হে নবী, আপনি মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলমানদের কঠোর শত্রু হিসেবে দেখতে পাবেন।' (আল মায়িদা ঃ ৮২)

৭. আল্লাহর প্রতি কলংক আরোপ ঃ তাদের নির্যাতন, ষড়যন্ত্র ও ফাসাদ থেকে মানুষতো দূরে থাক, স্বয়ং আল্লাহও মুক্ত নন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ (সূরা আল মায়েদা)

অর্থ ঃ 'ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বদ্ধ। আসলে তাদের হাতই বদ্ধ; তাদের এই বক্তব্যের জন্য তাদের উপর অভিশাপ। বরং আল্লাহর হাত প্রসারিত ও উন্মুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।'

ইহুদী জাতীয়তাবাদ

ইসলাম সকল ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে। তাই ইসলামের সাথে ইহুদী ধর্মের কোন সংঘাত নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে, ইহুদী ধর্ম বিকৃত। বিকৃত না হলে তারা শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হয়ে মুসলমান হয়ে যেত। মুসলমানদের সংঘাত হচ্ছে, সাহ্ইউনী বা যায়নবাদী ইহুদী জাতীয়বাদের সাথে। পূর্ব জেরুসালেমের সাহইউন পাহাড়ের নামানুসারে এই জাতীয়তাবাদের নামকরণ করা হয়েছে। ইংরেজীতে এটাকে Zionism বলে এবং বাংলায় 'যায়নবাদ' বলে।

ইহুদীবাদ ও যায়নবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইহুদী ধর্মের অনুসারীকে ইহুদী বলা হয়। কিন্তু যায়নবাদের জন্য ইহুদীবাদের অনুসরণ জরুরী নয়। যায়নবাদে বিশ্বাসী অন্য ধর্মের অনুসারীও যায়নবাদী হতে পারে। যায়নবাদের মূলকথা হল, সাহ্ইউন পাহাড়ে পুনঃ প্রত্যাবর্তন। তারা ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। ১৮৯৭ খৃঃ থিওডোর হার্জল বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেস গঠন করে সর্বপ্রথম এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে। বহু অ-ইহুদী যায়নবাদে বিশ্বাসী। এর মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, বেলফোর ঘোষণাদানকারী জেমস আর্থার বেলফোর এবং শান্তির মধ্যস্থতাকারী সুইস দূত কাউন্ট বার্নাদোত রয়েছেন। তারা খৃস্টান হয়েও যায়নবাদ বিশ্বাস করতেন। পরবর্তীতে ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদের কারণে আরো বহু লোক যায়নবাদী হয়ে গেছে ঃ

যায়নবাদকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১. রাজনৈতিক যায়নবাদ ঃ এই নীতির আলোকে মিসরের নীলনদ থেকে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত ইহুদীদের বৃহত্তর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। তাদের মতে, অন্যান্য জাতির সাথে ইহুদীদের বাস করা ঠিক নয়। তাদের জন্য বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

২. ধর্মীয় যায়নবাদ ঃ এটি তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হচ্ছে, ক. আল্লাহ খ. আল্লাহর মনোনীত জাতি ও গ. ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। এই তিন মূলনীতির উপর যায়নবাদীরা ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগাচ্ছে।

৩. আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যায়নবাদ ঃ এর মূলে রয়েছে ইহুদীদের মুক্তির

শ্লোগান। তারা বিশ্বাস করে, বনি ইসরাইলে এমন একজন নবীর আগমন হবে যিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে এক জায়গায় সমবেত করবেন। এটা তাদের একটা মিথ্যা ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

যায়নাবাদকে শুধু ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলাই ঠিক বরং তাকে বর্ণবাদও (Racism) বলা হয়। তারা কোন অ-ইহুদীর অস্তিত্ব সহ্য করতে রাজী নয়। জেরুসালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাতে ইহুদী-খৃষ্টান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

ইহুদীরা আল্লাহর অভিশপ্ত

আল্লাহ ইহুদীদের উপর স্থায়ীভাবে লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ যুগে যুগে, ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। মিসরের ফেরআউন শাইশাক ইসরাইল দখল করে এবং ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর ব্যাবিলনের রাজা বখতে নসর জেরুসালেম দখল করে ইহুদীদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখে। পরে পারস্য সম্রাট আরতাখসাসনার ইহুদী দাসদেরকে ইসরাইলে ফেরত পাঠান সত্য, কিন্তু তা তখন পারস্য সম্রাটেরই অধীন ছিল।

৬৬ খৃঃ রোমান সম্রাট তাইতুস জেরুসালেম দখল করে এবং ইহুদীদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করে। উপরন্তু ৭০ খৃঃ রোমান বাহিনী হাজার হাজার ইহুদীকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে দাস বানায়।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মুহূর্তে তারা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই ইহুদীরা ঐ সময় পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করে। এটাও তাদের জন্য বিরাট অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের দেশত্যাগ প্রয়োজন। কিন্তু কোন ইহুদী ইসরাইল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। তখন ইহুদী নেতারা জার্মানীর নাৎসী নেতা হিটলারের সাথে এক গোপন ইহুদী হত্যা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যাতে করে, বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের মধ্যে ভয়-ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা যায় এবং তারা ইসরাইলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৪ লাখ ৫০ হাজার ইহুদীর মধ্যে মাত্র ৭ হাজারকে ইসরাইল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় এবং অবশিষ্টদেরকে হত্যার নীল নকসা তৈরী করা

হয়।[২৯] হিটলার ইহুদীদেরকে গ্যাস চেম্বারে জড়ো করে গ্যাস বোমা মেরে হত্যা করে। সংখ্যার দিক থেকে এত বিপুল পরিমাণ ইহুদীকে ইতিপূর্বে আর কেউ হত্যা করেনি। এটা যদি আল্লাহর অভিশাপ বা গযব না হয়, তাহলে অভিশাপ আর কাকে বলে?

এরপরও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইহুদীরা ইসরাইলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় ইহুদী নেতারা বিশ্বের সর্বত্র ইহুদী হত্যার গোপন পরিকল্পনা হাতে নেয়। উদ্দেশ্য একই, আর তা হল তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা।

ইহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা হার্জল একবার রাশিয়ার ৩য় জার আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন, 'যদি ৬ থেকে ৭ মিলিয়ন ইহুদীকে কৃষ্ণ সাগরে ডুবিয়ে দেয়া সম্ভব হয়, তাতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।'*

তাই দেখা যায়, ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এবং ইহুদী নেতা ডেভিড গুরিওন ইহুদীরা ইসরাইলের হাইফা বন্দরে এসেও জাহাজ থেকে নামতে রাজী না হওয়ায় ইহুদী বোঝাই জাহাজটিকে বোমা মেরে সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ -

অর্থ ঃ 'আরো স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, তিনি কেয়মাত পর্যন্ত সব সময় বনি ইসরাইলের উপর এমন লোককে প্রভাবশালী করবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দান ও নির্যাতন করতে থাকবে।' (আরাফ-১৬৭)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَائُوْا بِغَضَبٍ مِّنْ اللهِ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِايَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقِّ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - (সূরা আল বাকারা)

---

২৯. Palestine, The Land of Prophethood , R. Garudy France. * The Case of Israel, A Study of Political Zionism, R. Garaudy, France, English edition, 1983.

অর্থ ঃ তাদের উপর অপমান ও অভাব লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবের শিকার হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করেছে এবং নবীদেরকে হত্যা করেছে, এটা ছিল তাদের নাফরমানী এবং তারা ছিল সীমালংঘনকারী।' তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'যারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করে, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীদেরকেও হত্যা করে, তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। তারাই ঐ সকল লোক যাদের আমল দুনিয়া এবং আখেরাতে ব্যর্থ– বেকার এবং যাদের কোন সাহায্যকারী নেই।'

মহান আল্লাহ ইহুদীদের ব্যাপারে আরো বলেন ঃ

كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

অর্থ ঃ 'তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত হয় না, যা তারা ইতিপূর্বে করেছে এবং তারা যা করে, তা কতইনা খারাপ।' এই হচ্ছে, ইহুদীদের উপর আল্লাহর গযবের কারণ।

ইহুদীদের ইসলাম দুশমনী

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবগুলোতেও সেই একই সুসংবাদ আছে। আগের সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) যখন নবুয়ত লাভ করবেন তখন আগের সকল ধর্ম বাতিল হয়ে যাবে। তাই তাদেরকে শেষনবী আনীত কিতাব ও জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করতে হবে। তাদের নবী ও আসমানী কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী যুক্তির দাবী ছিল, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর অনুসরণ করে মুসলিম হয়ে যাওয়া। কিন্তু তারা মুসলমান তো হয়ইনি, বরং ইসলাম ও শেষ নবীর বিরুদ্ধে হিংসা ও ক্রোধে জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকে। কেননা, তাদের ধারণা ছিল, তাদের কাওম বনি ইসরাইলে শেষ নবীর আগমন ঘটবে। তাই

তারা কিছুতেই মক্কার কুরাইশ বংশে আরবী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর অস্তিত্ব সহ্য করতে পারল না। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাজারো যড়যন্ত্র শুরু করে দিল। তাদের সেই ষড়যন্ত্র আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। মুসলমানদের সবচাইতে বড় দুশমন হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে মজীদে বলেছেন ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

অর্থ ঃ 'তুমি মুমিনদের বিরুদ্ধে ইহুদী ও মুশরিকদের কঠোরতম দুশমন হিসেবে দেখতে পাবে।' এই আয়াতে মুসলমানদের যে ২টা ঘোর শত্রুর কথা আল্লাহ বাতলিয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইহুদী, আর দ্বিতীয় হচ্ছে মুশরিক।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে বনি ইসরাইল তথা ইহুদীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। কুরআনের মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে ৫০টিতেই ইহুদীদের সম্পর্কে সরাসরি এবং পরোক্ষ ইশারা ইঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে এত বেশী আলোচনার উদ্দেশ্য হল, মুসলমানগণ তাদের ব্যাপারে যেন যথেষ্ট সতর্ক থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় যাওয়ার পরপরই একের পর এক ইহুদীদের শত্রুতা প্রকাশিত হতে থাকে। তারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলমান ও শেষ নবীকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মদীনার জীবনের ১ম চতুর্থাংশে তাদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন।

ইহুদী কবি আবি ইফক নিজ কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) তার ইসলাম দুশমনীর জন্য তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তারপর ইহুদী কাইনুকা গোত্রকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। এই গোত্রটি ইসলামের অসম্মান করে এবং একজন মুসলিম মহিলার ইজ্জত নষ্ট করে। এরপর ইহুদী কবি কাব বিন আশরাফকে হত্যা করা হয়। সেও নিজ কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করতে থাকে। তারপর ইহুদী বনি নাদীর গোত্র রাসূলুল্লাহকে (সা) নিজেদের ঘরের দেয়ালের পার্শ্বে বসায় এবং ছাদ থেকে বড় পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই অপরাধের কারণে তাদেরকেও মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। তারপর আহযাব যুদ্ধে ইহুদী বনি

কুরাইজাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ করে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ায় তিনি তাঁদেরকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। এইভাবে মদীনা থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করার পর তিনি মদীনার বাইরের ইহুদীদের প্রতি দৃষ্টি দেন। কেননা, বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে খায়বারে ইহুদীদের সংগঠক আবু রাফে সালাম বিন আবিল হাকীক নাদারীকে হত্যা করেন। তারপর ইহুদীরা আসীর বিন রাযেমকে আবু রাফের পরিবর্তে নেতা নির্বাচিত করে ইসলামের বিরুদ্ধে পুনরায় সংগঠিত হয়। পরে আসীরকেও হত্যা করা হয়। হোদায়বিয়ার সন্ধির দুইমাস পর খায়বার ও পার্শ্ববর্তী ইহুদী গ্রামগুলো মুসলমানদের দখলে আসে।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র এখানে এসেই থেমে যায়নি। পূর্বে নবী হত্যাকারী এই সম্প্রদায় প্রথম পর্যায়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। কয়েকদফা ব্যর্থ চেষ্টার পর তারা শেষ পর্যায়ে আংশিক সফল হয়। খায়বারে একজন ইহুদী মহিলা একটি বিষমাখা ভেড়া রান্না করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খেতে দেন। মহিলাটি জানত যে, তিনি উপহার গ্রহণ করেন। তাই সে ঐ ভেড়াটি উপহার দেয়। তিনি একটু খেয়ে খানা বন্ধ করেন এবং বলেন, আমার মনে হচ্ছে তা বিষাক্ত। এই বিষমাখা ভেড়ার গোশত খেয়ে একজন সাহাবী ইনতিকাল করেন। তাঁর নাম হচ্ছে বিশর বিন বারা। রাসূলুল্লাহর (সা) পরবর্তী জীবনে ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া দেয়া দেয়। এমন কি মৃত্যুকালীন রোগে তিনি বিষের ক্রিয়া অনুভব করেন। তিনি তখন বিশর বিন বারার বোনকে বলেন, তোমার ভাইয়ের সাথে যে বিষাক্ত খানা খেয়েছি তার ফলে এখন আমার হৃদনালী কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সাহাবায়ে কেরামের মতে, তিনি ভেড়ার বিষক্রিয়ার ফলে সাধারণ মৃত্যু নয়, বরং শাহাদাত বরণ করেছেন। এছাড়াও ইহুদী যাদুকর লবীদ বিন আসেম যাদুর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তাদের সেই পরিকল্পনা নস্যাত করে দেন। কূপ থেকে যাদু আবিষ্কার করে তা নষ্ট করে দেয়া হয়। ইহুদীরা হচ্ছে এমন এক জাতি, যারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী-রাসূলদেরকে হত্যা করেছে এবং এ যাবত বিশ্বের সকল যুদ্ধ ও গোলযোগের পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। তারা হচ্ছে রক্তপিপাসু জাতি। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَأَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ، وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'তারা যখন যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন। তারা যমীনে বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।'

ইহুদীদের ঐ সকল ষড়যন্ত্র ইতিহাসের কাল অধ্যায়ে লিখিত আছে। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় উল্লেখিত ইহুদী ষড়যন্ত্রের পর ইসলামী খেলাফতের সময়ও তাদের বিষাক্ত ছোবল অব্যাহত থাকে। প্রখ্যাত ইহুদী ষড়যন্ত্রকারী আবদুল্লাহ বিন সাবার প্ররোচনায় মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যার ফলে, তাদের একটা অংশ হযরত ওসমান (রা) কে শহীদ করে। তাদের ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে হযরত আলীর পর ইসলামী খেলাফতের অবসান হয়।

তুরস্কের ওসমানী খেলাফতের পতনের জন্য মাদহাত পাশা নামক ইহুদীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কামাল আতাতুর্ক ছিল ইহুদীদের প্রতিনিধি। তার হাতে উসমানী খেলাফতের অবসান হয়। অপরদিকে ইহুদী কালমার্ক্স ছিল কুফরী মতবাদের আবিষ্কর্তা। তার তৈরি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নির্যাতনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে কোটি কোটি মুসলমান নিগৃহীত হয়েছে। এরপর ইহুদী বিজ্ঞানী ফ্রয়েড মানুষের মধ্যে পাশবিক চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়ে ইসলামের মানবিক আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে। ইহুদী সমাজবিজ্ঞানী দূরকায়েম ইসলামের পারিবারিক প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরে সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সমাধি রচনা করতে চেয়েছে। ইহুদী প্রাচ্যবিদ গোল্ড তাসিহর ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবিদ্যার জন্ম দিয়ে ইসলামী আদর্শের ক্ষতির ভিত্তি তৈরী করেছে।

ইহুদী সামইউল যুইমার মুসলিম বিশ্বে খৃস্টানদেরকে উস্কানি দিয়ে খৃস্টান মিশনারী তৎপরতা শুরু করায়। এর ফলে অনেক মুসলমান খৃস্টান ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। তার লক্ষ্য ছিল ঃ খৃস্টানদেরকে দিয়ে মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করা।

ইহুদী থিওডোর হার্জল *'ইহুদী রাষ্ট্র'* নামে একটা বই লিখে মধ্যপ্রাচ্য সংকট সৃষ্টি করেছে। সেই বইতে ইহুদী রাষ্ট্রের কল্পিত মানচিত্র অংকন করে ইহুদীদেরকে উৎসাহিত করেছে। তার মৃত্যুর পর ইসরাইল নামক যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মুসলমানদের জন্য তথা বিশ্বের শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ।

ইহুদী চিন্তার আলোকে পবিত্র স্থান ও হাইকাল

ইহুদীরা হাইকালে মুসলিম উত্তরাধিকার স্বীকার করে না। তারা হাইকালকে ইহুদী ধর্মের আলোকে পুনঃ নির্মাণ করতে চায়। তাদের ধারণা ইসলামের পূর্বে হাইকালকে ২ বার ভাঙ্গা হয়েছে। তাই এখন তাদের ৩য় হাইকাল নির্মাণ করতে হবে। তাদের আরো ধারণ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের হাতে পড়ে হাইকালের বহু বিকৃতি ঘটেছে, সে বিকৃতি দূর করা প্রয়োজন।

বিন গুরিয়ন ও মানাচেম বেগিন বলেছেন, 'জেরুসালেম ছাড়া ইসরাইলের কোন মূল্য নেই এবং হাইকাল ছাড়া জেরুসালেমের কোন অর্থ নেই।' এটা এখন ইসরাইলের জাতীয় শ্লোগান হিসেবে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগের ইহুদীরা ইসরাইলের জাতীয় পতাকায় হাইকালকে ছয় তারকা বিশিষ্ট প্রতিকের মর্যাদা দিয়েছে। এটা তাদের কাছে দাউদ তারকা নামে পরিচিত। ইসরাইলী পতাকার মাঝখানে ঐ প্রতীক অবস্থান করছে। তাদের গাড়ী, বিমান ট্যাংক ও ক্ষেপনাস্ত্রের মধ্যে ঐ প্রতীক বিরাজ করছে। তাদের মতে হযরত দাউদ (আ) হচ্ছেন ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। অথচ তারা এর আগে ইয়াকুবকে (আ) ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বলেছিল।

ইসরাইলের লিখিত কোন সংবিধান নেই। তাদের সর্বোচ্চ সংবিধান হচ্ছে তাওরাত। এই দৃষ্টিতে তাদের রাষ্ট্রটি হচ্ছে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। আরো বেশি আরব মুসলিম রাষ্ট্র গ্রাস করার লক্ষ্যে তারা এখন পর্যন্ত ইসরাইল রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক সীমানা ঘোষণা করেনি। তারা তাওরাতের বর্ণিত বৃহত্তর ভূ-খণ্ডকেই নিজেদের রাষ্ট্রের সীমানা মনে করে। ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কথা বলছে। যদিও তাদের মধ্যে উন্নত চারিত্রিক গুণ নেই। বাতিল ও বিকৃত ধর্মে সেরূপ চারিত্রিক গুণাবলী কিভাবে আসতে পারে? এখন আমরা হাইকাল সম্পর্কে ইহুদীদের অতীত ও বর্তমান চিন্তার উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. তাওরাতে হাইকাল

তাওরাতের ১ম অধ্যায়ে সৃষ্টি পর্যায়ে, আল্লাহর ওয়াদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাতে ইবরাহীমকে (আ) বলেছেন, 'আমি তোমার বংশধরকে এই যমীন দান করবো'। অথচ ইহুদীরা ভুলে গেছে, ইবরাহীম (আ)-এর বংশের ইসমাঈল শাখাও রয়েছে। তাই বনি ইসমাঈল আল্লাহর ঐ ওয়াদার অংশীদার। মুসলমান হচ্ছে

ইসমাঈলের (আ) বংশধর। তাওরাত ইয়কুব (আ) সম্পর্কে বলছে, 'তুমি বাইতে ইলে যাও এবং সেখান বাস কর। সেখানে তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে একটি জবেহর স্থান তৈরি কর।' বাইতে ইল বলতে বাইতুল মাকদিসকে বুঝানো হয়েছে।

ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তাওরাতের বক্তব্য হল, ইউসুফ (আ)-এর হাড়গোড় মিসর থেকে জেরুসালেমে নিয়ে আসা হয়েছে। তাওরাত মূসা (আ) সম্পর্কে বলে ঃ মূসা (আ) ফেরাউনকে বলেছেন, আমার জাতিকে ছেড়ে দাও। ফেরাউন বলেছে, আমি তাদেরকে ছাড়বো না। হযরত মূসার (আ) উদ্দেশ্য ছিল, বনি ইসরাইল জেরুসালেমের পবিত্র স্থানে এসে ইবাদাত করবে।

তাওরাত মূসা (আ)-এর পরবর্তী নবী ইউশা' বিন নূনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছে, আল্লাহ্ তাঁকে জেরুসালেমের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তীহ ময়দানে অবস্থানরত ইহুদীদেরকে নিয়ে অভিযানের হুকুম দেন।

এইভাবে তাওরাত বনি ইসরাইলের নবীদের সাথে জেরুসালেম নগরীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছে। তারপর হযরত দাউদ এবং সুলাইমান (আ) এর সোনালী যুগ নিয়েও আলোচনা করেছে। জেরুসালেমের পবিত্র স্থান সম্পর্কে ইহুদীরা তাওরাত থেকে যে রকম প্রেরণা পায়, ঠিক সে ধরনের প্রেরণা খৃস্টানদের মাঝেও রয়েছে। কেননা ইহুদীদের মত তাওরাত এবং ইঞ্জিল তাদেরও পবিত্র কিতাব।

২. তালমুদে হাইকাল

তালমুদ হচ্ছে তাওরাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত বিরাট বই। তাই এটিও ইহুদীদের কাছে পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা তাওরাত থেকেও বেশি পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। হাখামাত ইহুদীরা ৪শ' থেকে ৬শ' খৃস্টাব্দে এই গোপন কিতাবটি রচনা করে। এই কিতাব ইহুদীদের চিন্তা পরিকল্পনার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি তাওরাতের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে তাতে পবিত্র স্থান এবং হাইকাল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে। তালমুদে বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে সর্বদাই অতিরিক্ত বক্তব্য রয়েছে এবং আলোচনায় বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। মূল তাওরাত বিকৃত হওয়ার কারণে তার ব্যাখ্যা অবিকৃত হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। তালমুদ বলেছে, ফিলিস্তিনের মাটি পবিত্র। বনি ইসরাইলের নেককার লোকদের সেখানেই দাফন করা উচিত। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে,

কাফনের সাথে সেখানকার কিছু মাটি দেয়া উচিত।

৩. হাইকাল এবং ইহুদী পণ্ডিতদের তৈরি প্রটোকল

ইহুদীদের এই প্রটোকলটি এমন একটি বই যা বিশ্ব ইহুদী রাষ্ট্রের কল্পিত সীমানা অংকন করেছে। এই বই অনুযায়ী জেরুসালেম থেকে হযরত দাউদ (আ)-এর বংশধরগণ, গোটা বিশ্ব শাসন করবে। ১৮৯৭ খৃঃ সুইজারল্যান্ডের বেস্‌ল শহরে আধুনিক যায়নবাদের প্রবক্তা থিওডোর হারজালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ইহুদী সম্মেলনে ইহুদী নেতৃবৃন্দ ২৪টি প্রটোকল তৈরি করে। ঐ সম্মেলনে ৫০টি ইহুদী সংগঠনের বিরাট সংখ্যক ইহুদী চিন্ত াবিদ ও দার্শনিক অংশ নেয়। তখন থেকে তারা প্রতিবছর ১ বার আন্তর্জাতিক ইহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

ইহুদী প্রটোকলটি তাদের কাছে আধুনিক ইহুদী চিন্তাধারার উৎস বলে বিবেচিত হয়। তৃতীয় প্রটোকলে উল্লেখ করা হয়েছে, "আমাদের উদ্দেশ্যের পথে যে কোন অন্তরায়কে আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো। আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীয়তে দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে তার যমীনে শাসন করার জন্য বাছাই করেছেন এবং তিনি আমাদরেকে সেই যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। আমরা যখন সক্ষম হবো, তখন গোটা বিশ্ব শাসন করবো এবং তখন আমাদের ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মকে সহ্য করবো না।" তাওরাত ও তালমুদ অনুযায়ী হাইকাল তৈরির পর তারা জেরুসালেম থেকে গোটা বিশ্বকে শাসন করার জন্য একজন শাসকের অপেক্ষা করছে।

৪. যায়নবাদ ও হাইকাল

ইহুদী প্রটোকল অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে কার্যকর আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তাকে আধুনিক যায়নবাদ আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনটি জেরুসালেম ও হাইকাল পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে কর্মসূচী দিয়ে থাকে। যায়নবাদের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এটি ইহুদীদের একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

ইহুদী বিশ্বকোষে 'যায়নবাদে'র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ইহুদীরা নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা, জেরুসালেমে আগমন, শত্রুদের উপর বিজয়, মসজিদে আকসার বদলে হাইকাল নির্মাণ এবং সেখানে উপাসনা করতে চায়।

ইতিমধ্যে ইহুদীরা যায়নবাদী আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের কয়েকটি অর্জন করতে সফল হয়েছে। তারা ফিলিস্তিনে ফিরে এসেছে ও সেখানে ইসরাইল নামক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জেরুসালেমকে ইসরাইলের

রাজধানী ঘোষণা করেছে। এখন তারা তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ইহুদী কিবলা বা ৩য় হাইকাল নির্মাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

সেজন্য তাদের সামনে মুসলমানদের ১ম কিবলা মসজিদে আকসা ভাংগার অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু বাকী নেই।

প্রথম ইহুদী প্রধানমন্ত্রী বিন গুরিয়ন বলেছেন, 'আমরা সাময়িকভাবে তলোয়ার খাপবদ্ধ রেখেছি। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হলে আমরা অবশ্যই তলোয়ার ধারণ করবো। ইহুদী জাতি নীলনদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত নিজ বাপ-দাদার ভূমিতে বসতি স্থাপন.করবে।'[৩০]

৫. হাইকাল ও ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন

ইংল্যান্ডের প্রাচ্যবিদ ডোজির মতে, ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন বলতে বুঝায়, একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌছার জন্য বিভিন্ন মত ও পথের বহু লোকের একসাথে কাজ করা। আর সেই কাজটি হচ্ছে, ইসরাইলের প্রতীক হাইকাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ইংরেজীতে Free Mason শব্দের অর্থ হল, স্বাধীন রাজমিস্ত্রী। অর্থাৎ তারা কথিত হাইকাল তৈরির জন্য স্বাধীন রাজমিস্ত্রী।

ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনের শুরুতেই হাইকালে সুলাইমানী প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ইহুদীবাদ বিরোধী যে কোন ধর্ম ও মতবাদকে উৎখাত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হয়। যাতে করে ইহুদীরা গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব হাতে নিতে পারে। যায়নবাদের পরেই এই আন্দোলনের মর্যাদা হচ্ছে দ্বিতীয়। এগুলোর মাধ্যমে সম্প্রসারণবাদী ইহুদীরা নিজেদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে চায়।

ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন কাজের জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। তারা রোটারী ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, বার্থ ম্যাসন, ইউনিয়ন এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ইয়াহওয়া উইটনেস, বাহাই ইত্যাদি ছদ্মনামে নিজেদের কাজ করে থাকে।

১৯৫৬ খৃঃ ফ্রান্সে তাদের এক আনুষ্ঠানিক ইশতেহারে বলা হয়, আমরা ম্যাসন, আমরা অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষান্ত হতে পারি না। যুদ্ধে হয় আমরা জয়ী হবো, নয় তারা। হয় তারা মরবে, নচেত আমরা মরবো। সকল ইবাদতগাহ বন্ধের আগ পর্যন্ত আমরা আরাম পাবো না।

---

৩০. হায়াত বিন গুরিয়ন, ৩২ পৃঃ।

প্রতীক্ষিত মাসীহর আগমন ও হাইকাল পুনঃ নির্মাণ

আমরা প্রথমে ইহুদীদের প্রতীক্ষিত মাসীহ সম্পর্কে আলোচনা করবো। ইহুদীদের প্রতীক্ষিত মাসীহর আগমনের সাথে মসজিদে আকসা ধ্বংস ও সেই স্থানে তৃতীয় হাইকাল তৈরির বিশ্বাস গভীরভাবে জড়িত। তাদের এই ধারণা প্রাচীন। উপযুক্ত সময়ে সেই মাসীহ আসবে। অর্থাৎ হাইকাল তৈরির পর পরিবেশ অনুকূল হলে বহু প্রতীক্ষিত মাসীহ আসবেন এবং তাঁর হাতে ইহুদীরা মুক্তি ও পরিত্রাণ পাবে। তাকে তাদের বাদশাহ হিসেবে রাজমুকুট পরানো হবে। তিনি জেরুসালেম তথা ৩য় হাইকাল থেকে গোটা দুনিয়া শাসন করবেন। এই মাসীহ সর্বপ্রথম দুনিয়ায় আসবেন। কিন্তু খৃস্টানদের মতে, হাইকাল পুনঃ নির্মিত হলে মাসীহ ঈসা বিন মরিয়াম দুনিয়ায় পুনরায় আসবেন এবং সেটা হবে তার ২য় আগমন। কিন্তু ইহুদীদের মাসীহ খৃস্টানদের মাসীহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পুরুষ।

ইসলামের দৃষ্টিতে, কেয়ামতের সামান্য আগে হযরত মাসীহ ঈসা (আ) পুনরায় দুনিয়ায় আসবেন। তিনি মরিয়মের সন্তান হিসেবে হযরত দাউদের বংশধর। তাওরাতও সেই কথা বলেছে। কেউ কেউ তাওরাতে বর্ণিত প্রতীক্ষিত মাসীহ বলতে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওতকে বুঝিয়েছেন। সে অনুযায়ী সেই মাসীহ এসে গেছেন এবং ইহুদীরা তাঁর নবুওতকে অস্বীকার করে সেই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যাই হোক, মুসলিম ও খৃস্টানদের বিশ্বাস মোতাবেক যে মাসীহ ঈসার আগমন ঘটবে, ইহুদীরা তা অস্বীকার করায় তাদের ভাগ্যে সেই বিরাট কল্যাণ ও সৌভাগ্য জুটবে না।

তালমুদের মতে, তাদের প্রতীক্ষিত মাহদী আসার পর তিনি যখন বিজয়ী শাসক হিসেবে গোটা দুনিয়া শাসন করবেন তখন প্রতি ইহুদীর মাথাপিছু ২ হাজার ৩শ' দাস ভাগে পড়বে। মাসীহর আগমনের আগে যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তাতে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডঃ জোশেফ বারকলী তালমুদের উপর গবেষণার পর মন্তব্য করেছেন, ইহুদীদের কাছে প্রতীক্ষিত মাসীহর আগমন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৩১]

ইহুদীদের প্রতীক্ষিত মাসীহর মর্যাদা লাভ করার জন্য বিভিন্ন সময় বহু ইহুদী নিজেকে মাসীহ বলে দাবী করেছে। ৬৪০ খৃঃ, ৭২০ খৃঃ, ৭৫০ খৃঃ, ১৬৪৮ খৃঃ

---

৩১. আত্-তালমুদ, তারীখুহু ও তাআ'লীমুহু, পৃঃ ৫৯।

এবং ১৬৬০ খৃঃ পৃথক ব্যক্তিরা মাসীহ হওয়ার দাবী করে। শেষ পর্যন্ত ইহুদী চিন্তাবিদরা যে প্রটোকল তৈরি করেছে, এর আলোকে তারা গোটা দুনিয়ার গোলযোগ, বিশৃংখলা, অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়ে তাদের প্রতীক্ষিত মাসীহর আগমনের পরিবেশ সৃষ্টির অঙ্গীকার করেছে।

তাদের প্রটোকলের এক জায়গায় বলা হয়েছে, ইহুদীরা সেই মাসীহ ব্যতীত শান্তিতে বাস করতে পারবে না। চারদিক থেকে তাদের উপর অশান্তি নেমে আসবে। মাসীহ এসে তাদেরকে রক্ষা করবে। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য লোকেরা মাসীহকে চরম স্বৈরাচারী বলেও অভিহিত করবে।

প্রতীক্ষিত মাসীহ সম্পর্কে খৃস্টানদের বিশ্বাস

বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে বিশ্বাসী খৃস্টানরা হাইকালকে পবিত্র মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে খৃস্টবাদ হচ্ছে ইহুদীদেরই সম্প্রসারণ। তাই পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ তাওরাত যেটাকে পবিত্র ঘোষণা করেছে, নতুন নিয়ম অর্থাৎ ইঞ্জিলের অনুসারীদেরও উচিত সেটাকে পবিত্র মনে করা। তারা আরো বিশ্বাস করে, হাইকাল পুনঃনির্মিত হলে, হযরত ঈসা মাসীহ (আ) ২য় বার দুনিয়ায় আসবেন। তাই হাইকাল তৈরির উদ্দেশ্যে তারা ইহুদীদের সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

তারাও মুসলমানদের মসজিদে আকসা এবং সাখরাকে ধ্বংস করে সে স্থানে হাইকাল নির্মিত হলে খুশি হয়। কেনান, তাদের ধারণা হচ্ছে, তখন ইহুদীরা খৃস্টধর্মে প্রবেশ করবে এবং সবাই খৃস্টান হয়ে যাবে। অথচ ইহুদীরা প্রথম থেকেই খৃস্টানদের জাতশত্রু। সে জন্য তারা ঈসাকে (আ) শূলবিদ্ধ করে মারার ষড়যন্ত্র করে। তাদের ধারণা এই যে, তারা ঈসাকে (আ) হত্যা করেছে। কিন্তু কুরআন বলছে, আল্লাহ ঈসাকে (আ) ঐ ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার করেছেন এবং তাঁকে তারা হত্যা করতে পারে নি।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য হল, মসীহর আগমন ১ম না ২য় তা নিয়ে। কিন্তু মাসীহর আগমনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। যাই হোক, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী, মাসীহর আগমনের আগে তিনটি বিষয় অবশ্যই ঘটবে। সেগুলো হচ্ছে- ১. ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ২. জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী বানানো এবং ৩. হাইকাল পুনঃনির্মাণ করা। এগুলো হওয়ার পর মাসীহ ঈসার আগমন ঘটবে।

একজন আমেরিকান লেখিকা বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ খৃস্টান প্রটেস্ট্যান্ট তাওরাতের বক্তব্যের আলোকে বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সময় শেষ

এবং মহাপ্রলয় নিকটবর্তী। এই প্রটেস্ট্যাদের নিজস্ব বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র আছে এবং মার্কিন কংগ্রেসেও তাদের বহু সদস্য আছে। তারা এই বিশ্বাস অহরহ প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়নে বিশ্বাসী। এমনকি তাদের দাবী আর্থিক সংকট থাকলেও বাজেটে পারমাণবিক কর্মসূচীর জন্য বিরাট বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। উদ্দেশ্য হল, এর মাধ্যমে মাসীহর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করা অর্থাৎ উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে ঈসা মাসীহ আসবেন। এভাবে হারমাজদু দিবস উপস্থিত হবে।[৩২]

ঐ খৃস্টানদের দৃষ্টিতে, একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ আসন্ন এবং তা মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে ফিলিস্তিনেই সংঘটিত হবে। তাদের ও ইহুদীদের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ঐ খৃস্টানদের কিছু সংস্থা মুসলমানদের মসজিদে আকসা ও সাখরা ধ্বংস করে সেখানে হাইকাল নির্মাণের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

মার্কিন মিশনারী ওয়েন বলেছেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং জেরুসালেমকে এর রাজধানী করার পর শুধুমাত্র হাইকাল পুনঃনির্মাণ বাকী আছে। এর ফলে, মাসীহ (আ) এর আগমন ঘটবে। ইহুদীরা খৃস্টানদের সহযোগিতায় মুসলমানদের মসজিদে আকসা ভেঙে সেখানে হাইকাল তৈরি করবে। কেননা, ইঞ্জিল এ কথাই বলে। ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমানদের পবিত্র স্থানকে উড়িয়ে দেবে এবং ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রণের জন্য মুসলমানদেরকে উস্কানি দেবে। এর ফলে মাসীহ আসবেন এবং তাতে হস্তক্ষেপ করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তৃতীয় হাইকাল নির্মিত হওয়া উচিত।[৩৩]

হারমাজদু বা মাজদু দিবসের প্রতি বিশ্বাস

খৃস্টান ও ইহুদীদের যৌথ বিশ্বাস হল, ভাল ও মন্দ শক্তির মধ্যে একদিন সংঘর্ষ অনিবার্য। সেই দিনের সংঘর্ষ হবে, ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সংঘর্ষ। ঐ সংঘর্ষ ফিলিস্তিনে সংঘটিত হবে যা তেলআবিব থেকে ৫৫ মাইল দূরে, হাইফা থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং ভূ-মধ্যসাগরের তীর থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহুদী এবং খৃস্টানদের একটা অংশ আরো বিশ্বাস করে যে, ২শ' মিলিয়ন সৈন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ে মাজদুতে হাজির হবে। মাজদুকে আরমাগেদ্দনও বলা হয়।

৩২. Prophecy & Politics by Grace Halsell, U.S.A.
৩৩. Prophecy & Politics by Grace Halsell, U.S.A.

পবিত্র স্থান হাইকাল পুনঃনির্মাণ ও মাসীহর আগমন এবং মাজদু দিবসের ব্যাপারে ইঞ্জিলে বিশ্বাসী খৃস্টানদের ধারণা হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে কখনও সঠিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এমন কি মাসীহর আগমন ছাড়া বিশ্বের কোথাও শান্তি কায়েম হতে পারে না। তিনি আসার পর জেরুসালেমে হযরত দাউদের আসনে বসবেন এবং ইসরাইলের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। মূলতঃ ইহুদী ও খৃস্টানরা তাওরাতে বর্ণিত ঐ ঘটনার প্রতি বিশ্বাসী।

তালমুদ হারমাজদু যুদ্ধের বিষয়ে বলেছে, চূড়ান্তভাবে ইহুদী শাসন প্রতিষ্ঠার আগে তাদের সাথে অন্যান্য জাতির যুদ্ধ হবে। যার ফলে, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধে ইহুদীরা জয়ী হবে এবং জয়লাভ করার পর ৭ বছর ব্যাপী বিজিত অস্ত্রশস্ত্র জ্বালাবে। তখন বনি ইসরাইলের শত্রুদের দাঁত গজাবে এবং তা মুখ থেকে ২২ গজ পরিমাণ লম্বা হবে।

প্রখ্যাত মার্কিন খৃস্টান পাদ্রী জিমি সুগার্ট, ১৯৮৫ খৃস্টাব্দের ২২ শে সেপ্টেম্বর, মাজদু দিবসের যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এক টেলিভিশন ভাষণ দেন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানও বিভিন্ন সময় একই মত প্রকাশ করেছেন। ১৯৮৫ সালে সান রিগো ম্যাগাজিন, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যপ্রধান জেমস মিলসের এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাতে তিনি মাজদু দিবসের যুদ্ধ ও মাসীহর আগমন সম্পর্কে একই মতামত ব্যক্ত করেন।

মসজিদে আকসার ধ্বংস্তূপের ওপর হাইকালে সুলাইমানী নির্মাণেচ্ছু ইহুদী সংস্থাসমূহ

এখন আমরা ইহুদীদের মধ্যে যে সকল সংস্থা মসজিদে আকসা ধ্বংস করে সেখানে হাইকালে সুলাইমানী নির্মাণ করতে চায়, সে সকল সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. জোশ ইমুনিয়াম ঃ এর অর্থ হচ্ছে, ঈমান সংস্থা। এর অপর নাম হচ্ছে, যায়নবাদ সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মোশে লেভাঞ্জার। সংস্থার উদ্দেশ্য হল, অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজ্জায় ইহুদী বসতি স্থাপন করা এবং মসজিদে আকসার ধ্বংস্তূপের ওপর হাইকালে সুলাইমানী নির্মাণ করা। সংস্থাটি নিজ লক্ষ্য অর্জনে সহিংস তৎপরতায় বিশ্বাসী। এটি ইসরাইল সরকারের সমর্থনপুষ্ট।

২. ইয়াশিফাত আত্রিত কোহানিন ঃ এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন প্রথম ফিলিস্তিনী হাখাম ইব্রাহাম ইয়াতাসহাক কোল। তার অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, তারা হাইকালের দিকে রওনাকারী মিছিলের অগ্রপথিক। তারা হাইকাল পাহাড়ে ইহুদীদের উপাসনা সংক্রান্ত ফতোয়া প্রকাশের আগ পর্যন্ত সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকত। ১৯৮৫ খৃঃ সেই ফতোয়া প্রকাশিত হয়। তাদের কাছে হাইকাল পুনঃনির্মাণের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন রয়েছে। হাইকাল পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে তারা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করে থাকে।

৩. মসজিদে আকসা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ঃ এই সংস্থা মসজিদে আকসা জয় করে তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই তারা প্রকাশ্যে মসজিদে আকসা ধ্বংস করার ঘোষণা দিচ্ছে এবং তথাকথিত ইসরাইলী ভূখণ্ড থেকে সকল মুসলমানকে বিতাড়িত করার শ্লোগান দিচ্ছে। তাদের ঘোষিত আরেকটি লক্ষ্য হল, আল-খলীল শহর থেকে মসজিদে ইবরাহীমকে ধ্বংস করে শহরের চূড়ান্ত ইহুদীকরণ এবং তাকে ইহুদী উপাসনালয়ে রূপান্তরিত করা। ইতিমধ্যে আল-খলীল শহরে ইহুদী সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং মসজিদে ইবরাহীমির এক-তৃতীয়াংশের উপর ইহুদী উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাদের উপাসনালয়ের নামকরণ করা হয়েছে মাকফের উপাসনালয়। এই সংস্থার আধ্যাত্মিক গুরু হচ্ছে, ইয়াসরাইল আরিয়েল এবং হাখাম করন।

৪. সিউদাস শিসন ঃ এটি একটি সমাজকল্যাণ সংস্থার আকারে প্রতিষ্ঠিত। এর

আর্থিক যোগান আসে ইসরাইলের শিক্ষামন্ত্রণালয়, জেরুসালেম পৌরসভা ও ইসরাইলী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে। সংস্থার উদ্দেশ্য হল, ইহুদীদের নিকট হাইকাল ও জেরুসালেম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান। এ ছাড়া সেনাবাহিনীকেও এ ব্যাপারে জ্ঞান দান তাদের প্রধান কর্মসূচী। তারা ধর্মীয় স্থানসমূহে পবিত্র সফর করে থাকে। তারা শুধু হায়েতে মাবকীর কাছে ইহুদীদের উপাসনায় সন্তুষ্ট নয়।

৫. আল-হার হাশেম গোষ্ঠী ঃ এর অর্থ হল, 'আল্লাহর পাহাড়ের দিকে।' এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হল হাইকাল পুনঃনির্মাণ করা। সংস্থার প্রধান হল জারশন স্যালমন। সংস্থার অনুসারীদের একটা অংশ ১৪/৮/১৯৮৭ তারিখে মসজিদে আকসায় ইহুদী প্রার্থনা আদায় করে।

৬. হাতহাইয়া দল ঃ এর অর্থ হল ইহুদী পুনর্জাগরণ দল। এটি একটি অধার্মিক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে আকসার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। তাদের মতে, এর ফলে ইসরাইলের শক্তি ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসরাইলী পার্লামেন্ট নেসেটে ঐ দলের সদস্য রয়েছে। এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল হওয়া সত্ত্বেও দলের নেতা ইউভাল নেমান বলেছেন, আমি লজ্জা-শরম ছাড়াই বলছি, আমি লেবাননের দিকে তাকিয়ে আছি। কেননা, লেবানন ইসরাইলের অংশ ও পুনরুত্থানের ভূমি।

৭. ওমানা হাইকাল দল ঃ এই দলের লোকেরা বোরাক দেয়ালের আঙিনায় ইহুদী উপাসনার ব্যবস্থা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্মসূত্র ইহুদী স্টানলী গ্ন গোল্ডফোট এই দলের নেতা। তিনি একটি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে জড়িত। আছেন।

৮. পবিত্র হাইকাল সংস্থা ঃ ৫ জন বাইবেলিস্ট খৃস্টান এই সংস্থা কায়েম করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হল, মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার চক্রান্তে সহযোগিতা করা।

৯. পিটার সংস্থা ঃ এই সংস্থা মসজিদে আকসার আঙিনায় ইহুদী প্রার্থনার ওপর জোর দেয়। তারাও মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করতে আগ্রহী।

১০. মুকুট পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংস্থা ঃ এই সংস্থার চরমপন্থী ও গোঁড়া যুবকেরা জেরুসালেমের বিভিন্ন ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তির মালিকানা জবরদখল করে তাতে ইহুদী মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেমন মসজিদে আকসার চারদিক থেকে মুসলিম সম্পত্তি ও ঘড়-বাড়ী উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় এবং মসজিদে আকসার ইহুদীকরণ সহজতর হয়।

১১. হাশমু নাইম সংস্থা ঃ এই সংস্থার প্রধান লারনার সন্ত্রাসবাদী হিসেবে পরিচিত এবং সংস্থার সদস্যরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। সামরিক সেবা থেকে অবসর গ্রহণের পর তারা বল প্রয়োগ করে মসজিদে আকসার আঙিনা দখলের জন্য চেষ্টা চালায়। ১৯৮২ সালে তারা সাখরা গম্বুজ বিস্ফোরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিস্ফোরণের আগে বিস্ফোরক পরিবহন গাড়ীটাকে চিহ্নিত করা সহজ হয়। ফলে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়।

১২. সিউনিমেন্ট আন্দোলন বা নতুন যায়নবাদ ঃ ১৯৮৩ খৃঃ সাবেক ইসরাইলী সামরিক বাহিনী প্রধান রাফাইল ইতান এই সংস্থাটি গঠন করে। সেনাপতির দায়িত্ব পালনকালে ইতান চরম আরব ও মুসলিম বিদ্বেষী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৩. ওমানা আন্দোলন ঃ এর অর্থ হল সচিবালয় আন্দোলন। এটি একটি ইহুদী ধর্মীয় আন্দোলন। যার উদ্দেশ্য হল ইহুদী বসতি স্থাপন করা। এই আন্দোলনের সদস্যরা ইহুদী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। তারা ইহুদীদের মধ্যে এই ধারণা দিয়ে বেড়ায় যে, মাসীহ্র আগমনের মাধ্যমে মুক্তি আসবে এবং মাসীহ্র আগমন আসন্ন। তারা তাওরাতের সাথে সংঘর্ষমূখর যে কোন কিছুর বিরোধীতার আহ্বান জানায়। তারা অধিকৃত আরব এলাকায় ইহুদী বসতি বন্ধের ঘোর বিরোধী।

১৪. ইহুদা গোত্র ঃ তারা লাফতা গোষ্ঠী নামে অধিক পরিচিত। তাদের কাছে সামরিক শক্তি ও সম্ভার রয়েছে এবং একবার তারা বিস্ফোরক দ্রব্যের মাধ্যমে মসজিদে আকসা ও সাখরা উড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল।

১৫. কাখ আন্দোলন ঃ এর অর্থ হল, 'এইভাবে বন্দুক দিয়ে'। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে মার্কিন ইহুদী হাখাম মায়ের কাহানা। সে ইসরাইলী নেসেটের সদস্য ছিল। সে তালমুদের বক্তব্য অনুযায়ী ফিলিস্তিন থেকে মুসলমানদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে উচ্ছেদের পক্ষপাতি। তার মতে ফিলিস্তিন শুধু ইহুদীদেরই আবাসভূমি। অধিকৃত আরব এলাকার মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি এই সংস্থা হুমকী পাঠায়। ১১/৪/১৯৮২ খৃঃ এই সংস্থার সদস্যরা মসজিদে উপর আক্রমণ করে কয়েকজন মুসলমানকে শহীদ করে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতার সময় মায়ের কাহানাকে গুলী করে হত্যা করা হয়।

১৬. হাইকাল পাহাড় তহবিল সংস্থা ঃ এটি একটি ইহুদী-খৃস্টান সংগঠন যা মসজিদে আকসার এলাকাকে ইহুদীকরনের জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানায়। ১৯৮৩ সাল আমেরিকায় ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ সংস্থা

জেরুসালেমে তার কেন্দ্রীয় অফিসের ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের খৃস্টানরা এই সংস্থার অর্থ যোগান দেয়। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রখ্যাত ধনী টেরি প্রজেনহোভার এই সংস্থার সভাপতি। ২৩/১/১৯৮৩ খৃঃ ইসরাইলের দাফার পত্রিকা লিখেছে, ইয়াহুদা ও সামেরায় ইহুদী বসতি নির্মাণের জন্য সংস্থা লক্ষ লক্ষ ডলার সাহায্য দিয়েছে। হাইকালে সুলাইমানী পুনঃনির্মাণ সংস্থার মূল লক্ষ্য।

১৭. আত্‌সমাউত আন্দোলন ঃ এটি একটি চরমপন্থী ধর্মীয় আন্দোলন। এটিও জোশ ইমুনিয়াম সংস্থার অনুরূপ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে।

১৮. মোয়ালুন ইবাদতগাহ আঙিনা আন্দোলন ঃ এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হল, মসজিদে আকসা ও সাখরার ভূমিসহ পার্শ্ববর্তী ভূমিগুলো জবরদখল করা এবং সেই জায়গায় ইহুদী এবাদতগাহ নির্মাণ করা।

১৯. সাইউরি তেসিওন লীগ ঃ এটি ইহুদী ধর্মীয় স্কুলের অধীন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হইল ইহুদী সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য ইহুদীদেরকে ইহুদী ইবাদতখানা ও জেরুসালেম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করা।

২০. ইহুদী সেনাবাহিনীর মধ্যকার গোপন সংস্থা ঃ এই সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগে পরিষ্কারভাবে জানা না গেলেও ১৯৮৪ খৃঃ দেখা গেছে, ইসরাইলী বিমান বাহিনী মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছিল। ইসরাইলের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছে, এই সংস্থার অধিকাংশ সদস্য পরিচিত ইহুদী ধর্মীয় দলসমূহের সদস্য নয়। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করতে চায়।

ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদ

ক্রিশ্চিয়ান য়ায়নবাদ হচ্ছে খৃস্টবাদের ক্রমবর্ধমান একটি মারাত্মক ধারা। উনিশ শতকে আমেরিকান নাগরিক সাইরাস স্কোফিল্ড বাইবেলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে ব্যাখ্যা করেন, তা থেকেই স্কোফিল্ড বাইবেল, আজকের যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় বাইবেল, যা সর্বত্র রেফারেন্স বাইবেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৩৪]

স্কোফিল্ড তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, যীশুখৃস্ট অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) সে পর্যন্ত পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবেন না, যে পর্যন্ত না আগে কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে, জেরুসালেমে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন ও এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, হাইকালে সুলাইমানী পুনঃনির্মাণ এবং সবশেষে আরমাগেদ্দন (হারমাজদু) যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। আরমাগেদ্দন ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী অধিকাংশ লোক, বাইবেলের স্কোফিল্ড ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনে করে, ফিলিস্তিন হচ্ছে, ইহুদীদের জন্য আল্লাহর নির্বাচিত ভূমি। আমেরিকা, বৃটেন, ইটালীসহ খৃস্টান বিশ্বের বহু লোক স্কোফিল্ড বাইবেল অনুসরণ করে। একমাত্র আমেরিকার ১ কোটি থেকে ৪ কোটি খৃস্টান স্কোফিল্ড বাইবেলের অনুসারী। তাদের মতে, ইসরাইল কি করে তা নিয়ে মাথা ব্যথার কিছু নেই। ঈশ্বর চায় বলেই ইসরাইল ঐ সকল ঘটনা ঘটাচ্ছে।[৩৫]

তাদের মতে, অন্যান্য লোকদেরও উচিত, লেবাননে ইসরাইলী আগ্রাসন এবং এর ফলে ১ লাখ লিলিস্তিনীর হতাহত হওয়া, ইরাকের পারমাণবিক চুল্লীর উপর ইসরাইলের বোমা বর্ষণ, ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনীদের হাড়গোড় ভেঙে বিকল করে দেয়া, ফিলিস্তিনী শিশুদেরকে গুলী করে হত্যা করা, তাদের বাড়ী-ঘর ভেঙে দেয়া এবং ৩ হাজার বছরের পুরাতন আবাসভূমি ফিলিস্তিন থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা সহ ইসরাইলের এ জাতীয় সকল মানবতা-বিরোধী কাজের প্রতি সমর্থন জানানো।[৩৬]

তাই দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদীরা বিভিন্ন দেশে ইসরাইলী স্বার্থের অনুকূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে।

---

৩৪. Prophecy & Politics by Grace Halsell, U.S.A.
৩৫. Prophecy & Politics by Grace Halsell, U.S.A.
৩৬. Prophecy & Politics by Grace Halsell, U.S.A.

ইসরাইল ও ইহুদীদের কোন অন্যায় নেই। অন্যায় হচ্ছে অ-ইহুদীদের। ইহুদীরা ঈশ্বরের প্রিয় জাতি, আর অন্যরা অপ্রিয় জাতি।

যাই হোক, ইসরাইলের প্রতি তথাকথিত ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির কারণে আমেরিকাসহ খৃস্টান বিশ্বের বিরাট জনগোষ্ঠী ইসরাইলের প্রতি যে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক সমর্থন জানাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, একজন লেখকের লেখায় মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে সেটাকে ধর্মের অংশ মনে করা স্বয়ং সেই ধর্মেরই দুর্বলতা এবং অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ। মূল ধর্মগ্রন্থে এ জাতীয় সমর্থনের কথা থাকলে হয়তো সেটাকে একটা যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যেত। কিন্তু স্কোফিল্ডের মনগড়া ব্যাখ্যায় কিভাবে তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত খৃস্টান বিশ্ব ইহুদী ইসরাইলীদের সকল অন্যায়কে ন্যায় বলে মেনে নিচ্ছে তা চিন্তা করলেও গা শিউরে উঠে। তাও ১৯ শতকের মাথায় এসে ঐ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

গ্রেস হালসেল লিখেছেন, ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদ শুধু আরব ও ফিলিস্তিনী জনগণের জন্যই হুমকি নয়, বরং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যও হুমকিস্বরূপ। কেননা, ইসরাইল এমন এক দস্যু জাতি যাদের দ্বারা আজ আমরা পরিচালিত। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক কোন নীতি নেই; ইসরাইল যা বলে এ বিষয়ে তাই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি।[৩৭]

গ্রেস হালসেল তাঁর বইতে আরো বলেছেন, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৌলবাদী নামে খ্যাত খৃস্টানসহ আরো বহু খৃস্টানকে দেখেছি, তারা ইহুদীদের হুমকির ব্যাপারে সচেতন। এই খৃস্টানরা মনে করে, যীশুখৃস্ট ছিলেন মানবতার বাহক, ঈশ্বরের শান্তির বাণী আনয়নকারী, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সম্প্রীতির প্রবক্তা। তাই ইসরাইলের হত্যা, নির্যাতন, বহিষ্কার, বাড়ীঘর উচ্ছেদসহ যাবতীয় অমানবিক ও বর্বর তৎপরতাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কেননা, তা যীশুর শিক্ষা-বিরোধী।

আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে, ইহুদীদের সাথে খৃস্টানরাও মসজিদে আকসা এবং সাখরা ধ্বংস করার অভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং সেই স্থানে হাইকাল তৈরির স্বপ্নে বিভোর রয়েছে। এখন আমরা ঐ সকল খৃস্টান সংস্থাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

---

৩৭. Prophecy & Politics by Grace Halsell, U.S.A.

১. গীর্জা

প্রথমতঃ গীর্জার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আমেরিকার ইহুদীরা নিজেদের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খৃস্টান গীর্জাকে সহায়ক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে। গীর্জা রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ও নিজস্ব প্রচারপত্রের মাধ্যমে কোটি কোটি লোকের কাছে বাণী পৌছায়। তাছাড়াও গীর্জার প্রভাবাধীন বিরাট সংখ্যক স্কুল রয়েছে। পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও সেখানে যতটুকু নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ টিকে আছে, তা গীর্জারই অবদান। আমেরিকার মত বৃটেনের গীর্জারও একই অবস্থা। তারা হচ্ছে প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টান। তারা তাওরাতকে মূল কিতাব এবং ইঞ্জিলকে তার শাখা বলে মনে করে। তারাও ইহুদীদের স্বার্থে কাজ করে থাকে। অপরদিকে, ইটালীর ক্যাথলিক গীর্জার অনুসারীরাও ইহুদীদের দাবীর সমর্থক। কেননা, ইটালীর ক্যাথলিক পোপ ইসরাইলের শ্রমিক দলীয় প্রধান শিমুন পেরেজের সাথে আলোচনার পর ইহুদীদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে। পোপ আলোচনায় নিশ্চিত হয়েছে যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করেনি। এই হচ্ছে তথাকথিত ইহুদী-খৃস্টান সহযোগিতার ভিত্তি।

২. যায়নবাদী বাইবেলিস্ট

এরা হচ্ছে, এংলিক্যান গীর্জার অনুসারী ও নিষ্ঠাবান যীশুপন্থী। তাদের মতে, ধর্মের প্রচার-প্রসার জরুরী। তথ্য মাধ্যমগুলো তাদেরকে মৌলবাদী খৃস্টান বলে আখ্যায়িত করে। আমেরিকায় খৃস্টান ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য তারা বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তারা আমেরিকার সবচাইতে বেশী শক্তিশালী খৃষ্টান সম্প্রদায়। বাইবেলিস্টদের মতে, মাজদু দিবসের যুদ্ধের সাথে হাইকাল নির্মাণের ঘটনা জড়িত। তারপর ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মাসীহর আগমন ঘটবে। তাই এ সম্প্রদায়টি ইহুদীদের মসজিদে আকসা ভাঙার পরিকল্পনাকে সমর্থন জানায়। তাদের আশংকা হল, এর ফলে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

মার্কিন লেখিকা গ্রেস হালসেলের মতে, এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা হল ৮৫ মিলিয়ন বা সাড়ে ৮ কোটি। বাজারে বিক্রীত বইয়ের মধ্যে তাদের বই সংখ্যা হচ্ছে এক -তৃতীয়াংশ এবং তাদের রয়েছে ১৩শ' রেডিও স্টেশন। যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী স্কুলের মধ্যে তাদের স্কুলসমূহের ছাত্রসংখ্যা সর্বাধিক। তারা পবিত্র স্থান দেখার আওতায় জেরুসালেমে ধর্মীয় সফরের আয়োজন করে। বাইবেলিস্টদের চিন্তা-ধারার অনুসারী আরো আড়াইশ' সংস্থা আছে যারা

যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের সহযোগিতায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে। এদের মধ্যকার কোন কোন সংস্থা ৩য় হাইকাল নির্মাণে সরাসরি অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অধিকৃত আরব এলাকায় নিজেদের শাখা কায়েম করেছে। ইহুদী-খৃস্টান মৈত্রীর কারণে কিছুসংখ্যক খৃস্টান ব্যক্তিত্ব ইহুদীদের স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। তারা হচ্ছে ঃ

১. ম্যাটরন জিম ডোলস ঃ তিনি নিজে প্রকাশ্যে বলে বেড়ান যে, ইঞ্জিল ইহুদীদের কিতাব। তিনি দাউদ ও রেডক্রসের তারকা খচিত আংটি পরেন এবং কাঁধে আমেরিকা ও ইসরাইলের প্রতীক খচিত পতাকা বহন করেন। তিনি আরো বলেন, আমি খৃস্টান-ইহুদী এবং আমি আমেরিকা ও ইসরাইলের সাথে আছি।

২. পাদ্রী জিমি সুগার্ট ঃ তিনি একজন প্রধান বাইবেলিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত পাদ্রী। তিনি অনলবর্ষী ও প্রভাবশীল বক্তা। বক্তৃতায় তিনি মুহূর্তের মধ্যে লোকদেরকে হাসাতে ও কাঁদাতে পারেন। তিনি টেলিভিশনে খৃস্টান মিশনারী সম্রাট বলে পরিচিত। তিনি নিজের বাগ্মিতা ও দক্ষতার কারণে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি টিভি দর্শকের অন্তরে নিজ সাম্রাজ্য ও আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি বছরে কমপক্ষে ১৫ কোটি ডলার চাঁদা সংগ্রহ করতে পারেন। তাঁর ধারণা হচ্ছে, মাজদু যুদ্ধ আসন্ন। যত শান্তি চুক্তিই সম্পাদন করা হোক না কেন, তাতে কোন লাভ নেই এবং আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্য আমেরিকায় শান্তি আসতে পারে না। মধ্যপ্রাচের অবস্থা আরো খারাপ রূপ ধারণ করবে। মসজিদে আকসার স্থলে হাইকাল নির্মাণ প্রয়োজন যা হযরত মাসীহর আগমনের পথ পরিষ্কার করবে।

জিমি সুগার্ট দক্ষিণ আফ্রিকার প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ আহমদ দীদাতের সাথে এক বিতর্কে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হয়েছিলেন।

৩. পদার্থ বিজ্ঞানী লাগার্ট ডলফিন ঃ ইনস্টিটিউটের বিভাগীয় প্রধান। তিনি এমন এক এক্সরে মেশিন আবিষ্কার করেছেন যার মাধ্যমে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা জিনিসের ছবি সংগ্রহ করা যায়। তিনি তাঁর এই আবিষ্কারকে ইহুদীদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন। তিনি স্টানলি গোল্ড ফোর্ট নামক আরেকজন বিজ্ঞানীর সমভিব্যাহারে মসজিদে আকসা ও সাখরার উপর দিয়ে উড়ে যান এবং ছবি সংগ্রহ করেন। উদ্দেশ্য হল, মসজিদে আকসা ও সাখরা হাইকালে সুলাইমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়টি প্রমাণ করা।

৩. জেরুসালেমে অবস্থিত আন্তর্জাতিক খৃস্টান দূতাবাস

বাইবেলিস্টরা ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেরুসালেমে ঐ দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করে। দূতাবাস প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল, ইসলাম ও মুসলিমের বিরোধিতা করা। প্রতিষ্ঠার পরপরই দূতাবাস থেকে প্রচারিত এক ইশতাহারে বলা হয়, 'ইসলামের স্পিরিটের বিরুদ্ধে তোমাদের আহ্বান দরকার। তারপর আরো বলা হয় "আরব ও মুসলিম বিশ্বে রূহানী ইবাদতের জন্য ইসলামের খারাপ স্পিরিটই দায়ী। এছাড়াও গোটা বিশ্বের সর্বত্র এবং বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-বিরোধী ভূমিকার জন্য ইসলামের সেই রূহানিয়াতই দায়ী। ইসলাম আল্লাহর প্রতি বিদ্রূপ করে। কেননা, সবচাইতে পবিত্র পাহাড় সোরিয়ায় তাদের এই মসজিদ অবস্থিত। এটা হাইকালের পবিত্র স্থানে একটি বিরাট লজ্জা ও অপমানের বিষয়।" আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে উক্ত দূতাবাসের ১৫টি কনসুলেট আছে। সেগুলো সর্বদা ইসরাইলের স্বার্থে কাজ করছে। ১৯৮০ সালে *জেরুসালেম পোস্ট* পত্রিকা এক নিবন্ধে লিখেছে, কনসুলেটগুলো মার্কিন পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম, মিটিং এবং ইসরাইলের প্রতি ভালবাসার নৈশ অনুষ্ঠানে ইসরাইলের পক্ষে প্রচারণা চালায়।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠ নৈতিক সংস্থা

১৯৭৯ সালে পাদ্রী জিরী পালওয়েল এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থা বিশ্বের ৬শ' রেডিও-টেলিভিশন স্টেশনের মাধ্যমে 'ইঞ্জিলের ঘন্টা' শিরোনামে দৈনিক ১ ঘন্টা প্রোগ্রাম প্রচার করে। সংস্থার একটি সাময়িকী আছে এর নাম হচ্ছে, 'খৃস্টান ভয়েস।' মিঃ পালওয়েল তাঁর সংস্থার মাধ্যমে পবিত্র স্থানে সফরের উদ্দেশ্যে মাজদূ উপত্যকাসহ তাওরাতে বর্ণিত অন্যান্য স্থানগুলো ভ্রমণের কর্মসূচী হাতে নেন। এক জনমত জরীপে জানা যায়, মার্কিন কংগ্রেসের বাইরে পালওয়েল সর্বাধিক আশ্চর্যজনক ব্যক্তি। তিনি ইসরাইলের নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত বন্ধু। বিশেষ করে বেগিন ও এসহাক শামীরের বিশেষ বন্ধু। তার একটি মন্তব্য হল, 'ইসরাইল নামক এই ছোট দেশটির উপর রাশিয়া তার আরব মিত্রদের সহযোগিতায় পুনরায় আক্রমণ করবে।'

হাযকিয়াল নামক অন্য এক পাদ্রী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, রাশিয়া পরাজিত হবে, আল্লাহ আবারও ইসরাইলকে রক্ষা করবেন।

৫. ধর্মীয় গোলটেবিল সংস্থা

ডানপন্থী খৃস্টানদের কর্মসূচী সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনেকগুলো বড় বড় সংস্থা এর সাথে যুক্ত আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'পবিত্র কিতাবের অনুবাদকগণ' এবং 'মার্কিন গীর্জা সংস্থা'। গোলটেবিল সংস্থার কাজ অত্যন্ত গোপন। এর কাছে বিশ্বের হাজার হাজার মানুষের গোপন ফাইল আছে। ইহুদীদের প্রতি সমর্থন দেয়াকে তারা ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে।

৬. হাইকাল পাহাড় সংস্থা

টেরি রিজেনিহোভার তাওরাতে বর্ণিত ৩য় হাইকাল পুনঃনির্মাণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়নের জন্য এই সংস্থাটি কায়েম করেন। ইসরাইলের *দাফার* পত্রিকা ১৯৮৩ সালে এক নিবন্ধে লিখেছে, 'হাইকাল পাহাড় সংস্থা' জেরুসালেমের মুসলিম ওয়াকফ বিভাগের সম্পত্তি কিনে সেখানে ইহুদী বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সাহায্য করার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার চাঁদা সংগ্রহ করেছে। উক্ত অর্থ দ্বারা ৩য় হাইকাল নির্মাণেও সহযোগিতা করা হবে। ১৯৮৩ সালে মসজিদে আকসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ইহুদীদেরকে আটক করার প্রতিবাদ জানিয়েছেন রিজেন হোভার। তিনি তাদের আত্মরক্ষার জন্য মামলা পরিচালনার খরচ পাঠিয়েছেন। রিজেন হোভার একজন বড় ধনী এবং জমিন ও পেট্রোল ব্যবসায়ী। তিনি ইহুদী সংস্থা 'হাইকাল মোকাদ্দাসকে' বিরাট অংকের সাহায্য দিয়েছেন। তাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, মসজিদে আকসা কি হাইকাল তৈরির পথে বাধা? তিনি উত্তরে বলেন, 'মসজিদে আকসা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।'

জেরুসালেম শহরে খৃস্টানদের পবিত্র স্থান

জেরুসালেম শহরে খৃস্টানদের ২টা প্রধান পবিত্র স্থান আছে। ১. বেথেলহেম গীর্জা ও ২. কেয়ামাহ গীর্জা। কেয়ামাহ গীর্জাকে ইংরেজীতে Holy Sepulchre বলে।

বেথেলহেম গীর্জা ঃ হযরত ঈসা (আ) পশ্চিম জেরুসালেমের বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেন। বাইজেনটাইন সম্রাট কনস্ট্যান্টইন ৪র্থ শতাব্দীতে হযরত ঈসার জন্মস্থানে একটি গ্রীক অর্থোডক্স গীর্জা নির্মাণ করেন। বেথেলেহেম একটি ছোট শহর। এটি জেরুসালেম থেকে (৫ মাইল) ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এতে বর্তমানে ৩৫ হাজার লোক বাস করে। শহরের অধিবাসীরা

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী। ১৯৮৭ সালে ফিলিস্তিনী গণ-জাগরণ আন্দোলন শুরুর পর থেকে এ যাবত দীর্ঘ ৫ বছর, ২৫শে ডিসেম্বরের খৃস্টমাস দিবস পালন উপলক্ষে, গণ-জাগরণ আন্দোলনের সমর্থনে খৃস্টমাস প্যারেড ও সম্বর্ধনা মুলতবী রাখে। ফিলিস্তিনের খৃস্টানরা ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা চায়, অথচ ফিলিস্তিনের বাইরে যায়নবাদী খৃস্টানরা ইহুদীদের জবরদখলের প্রতি সমর্থন জানায়।

কেয়ামাহ্ গীর্জা ঃ এটি পূর্ব জেরুসালেমে মসজিদে আকসার কাছে অবস্থিত। খৃস্টানদের মতে, মাদ্রাসা উমারিয়া থেকে শুরু করে জালজালায় অবস্থিত কেয়ামাহ্ গীর্জা পর্যন্ত সড়কটি একটি দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী। যখন ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে চড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি নিজ পিঠে শূলের কাঠ বহন করে ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান। ঐ রাস্তার ১৪টি পর্যায় বা মনযিল আছে। ৯টি গীর্জার বাইরে এবং ৫টি গীর্জার ভেতর। খৃস্টানরা হযরত ঈসার অনুসরণে ঐ রাস্তা দিয়ে ধর্মীয় কাফেলায় অশংগ্রহণ করে চলতে থাকে। প্রতিটি পর্যায়ে যাত্রাবিরতি করে প্রার্থনা জানায়। কেয়ামাহ্ গীর্জা জেরুসালেমের সবচাইতে বড় গীর্জা। এতে একসাথে ৮ হাজার লোকের সংকুলান হয়। গীর্জাটি বহু ভাঙা-গড়ার পর বর্তমান পর্যায়ে পৌছেছে। এর ভেতর বহু নকশা ও ডিজাইন আছে। এর ভেতর অনেক জায়গায় গাধার উপর আরোহণরত অবস্থায় হযরত ঈসার ছবি এবং হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ছবিও রয়েছে।

পুরাতন শহরের দেয়ালের ভেতর ও বাইরে খৃস্টানদের আরো অনেক গীর্জা আছে। জেরুসালেম খৃস্টানদের কাছে আনন্দ ও বেদনা– এই উভয়েরই স্মারক।

মসজিদে আকসা ও সাখরায় ইহুদী আগ্রাসনের বিস্তারিত বর্ণনা

১৯৬৭ সালের ৫ই জুনের যুদ্ধে জেরুসালেম জবরদখল করার পর থেকে আজ পর্যন্ত অধিকৃত ফিলিস্তিনের পবিত্র স্থানসমূহের উপর ইসরাইলী আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। তাদের আচরণ দ্বারা বুঝা যায়, বাইতুল মাকদিসের ইসলামী চরিত্র পরিবর্তন করে ইহুদীকরণের আগ পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবার নয়। আর তাদের সেই ইচ্ছা মসজিদে আকসা ও সাখরার চিরস্থায়ী ধ্বংস করার আগ পর্যন্ত পূরণ হতে পারে না।

মসজিদে আকসা ও সাখরার উপর বার বার ইহুদী হামলার কারণ বিশ্লেষণ করলে যে মারাত্মক চিত্র ফুটে ওঠে, তা হচ্ছে,

১. পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্নভাবে জোরদার আক্রমণ চলছে।

২. ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত পক্ষসমূহের সংখ্যা এবং শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. ঐ সকল আক্রমণ কিংবা ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আরব ও মুসলিম বিশ্বের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়া উপযুক্ত নয়। এর কারণ দুটোর যে কোন একটি হতে পারে। হয় তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ, কিংবা বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখছেন।

৪. ইসরাইল সরকার মসজিদে আকসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী দল ও সংস্থাসমূহের জন্য আড়াল হিসেবে কাজ করে। যদি তারা কোন দুর্ঘটনা ঘটায় তখন সরকার বলে, এটা চরমপন্থীদলের কাজ কিংবা প্রত্যাখ্যাত সন্ত্রাস। তখন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অপরাধীদের ২/১ জনকে আটক করে এবং পর্দার অন্তরালে তাদেরকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দান করে। সময় সময় বিশেষ কোন শাস্তির ঘোষণা দিয়েও তাদেরকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দেয়।

৫. আল্লাহর নিজ কুদরতের বদৌলতে এ যাবত বহু ইহুদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন। মসজিদে আকসা ও সাখরার হেফাজতকারী শুধু জেরুসালেমের নিরস্ত্র ফিলিস্তিনীরা নয়, বরং গোটা বিশ্ব মুসলিম এর হেফাজতকারী। বাস্তবে ফিলিস্তিনী জনগণ ছাড়া মুসলিম মিল্লাতের অবশিষ্টাংশ ঘুমিয়ে আছে ও নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসছে না।

৬. এ ব্যাপারে ইসরাইল রাষ্ট্রের সরকারী নীতি খুবই পরিষ্কার। সরকার দুঃখজনক কোন ঘটনার মাধ্যমে মসজিদে আকসা ও সাখরাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন কামনা করে, অথবা দায়িত্বহীন কোন দল কিংবা মাতাল

দ্বারা অথবা ভূমিকম্পসহ এ জাতীয় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে মসজিদে আকসা ও সাখরার ধ্বংসনীতিকে অগ্রাধিকার দেয়। এ সকল কারণে ইসরাইলী সরকার মসজিদে আকসার আশেপাশে খনন কার্য অব্যাহত রেখেছে এবং সরকার সরাসরি তা ধ্বংস করতে চায় না বরং ভিন্নভাবে এর ধ্বংস কামনা করে।

খনন তৎপরতা

ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের জেরুসালেম জবরদখল করার পর থেকে আজ পর্যন্ত হাইকালে সুলাইমানী সংক্রান্ত এমন একটি নিদর্শন খুঁজে বেড়াচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করতে চায় যে, মসজিদে আকসা ও সাখরা হাইকালে সুলাইমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত। যেন তারা এই অযুহাত দেখিয়ে তা ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে পারে। এটা তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও এটাই সব নয়। বরং তাদের অন্যান্য অঘোষিত উদ্দেশ্য রয়েছে। ইহুদী জাতি হচ্ছে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোঁকাবাজ জাতি। তাই আমরা তাদের খনন ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর এ পর্যন্ত ১০ পর্যায়ে খননকার্য চালানো হয়েছে।

১ম পর্যায় ঃ জুন যুদ্ধের পর ইসরাইল মাগারেবা এলাকার বসতি উচ্ছেদ করেছে এবং দীর্ঘ ১ বছর যাবত পুরা এলাকায় খননকার্য পরিচালনা করেছে। তারা ১৪ মিটার গভীর পর্যন্ত খননকার্য চালিয়েছে। বাবুল মাগারেব মসজিদে আকসার নিকটবর্তী।

২য় পর্যায় ঃ মসজিদে আকসার পার্শ্ববর্তী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মুসলমানদেরকে উৎখাত করা হয়েছে এবং এই পর্যায়ে ১৯৬৯ খৃঃ মসজিদে আকসায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। মুসলিম বসতিগুলোতে ইহুদী ধর্মীয় স্কুল, ইনস্টিটিউট, পার্ক ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে এবং মসজিদে আকসার বেষ্টনী দেয়ালের ৮০ মিটার দূরে খালি করা মুসলিম এলাকায় ব্যাপক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়েছে।

৩য় পর্যায় ঃ ১৯৭০ খৃঃ থেকে ১৯৭২ খৃঃ পর্যন্ত সময়ে মসজিদে আকসার বেষ্টনী দেয়ালের নীচে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে খনন করা হয় এবং মসজিরে আঙিনার নীচ পর্যন্ত ঐ খননকাজ চলতে থাকে। এই পর্যায়ে ইসলামী শরীআহ কোর্টসহ বহু মুসলিম বাড়ী-ঘর দখল করা হয়।

৪র্থ পর্যায় ঃ ১৯৭৩ খৃঃ মসজিদে আকসার পশ্চিম দেয়ালের কাছে খনন কাজ চালানো হয় এবং দেয়ালের নীচে দীর্ঘ গর্ত খনন করা হয়। গর্তের গভীরতা ছিল ১৩ মিটার।

৫ম পর্যায় ঃ ১৯৭৪ সালে পশ্চিম দেয়ালের নীচে গর্তকে সম্প্রসারিত করা হয়।

৬ষ্ঠ পর্যায় ১৯৭৫-৭৬ খৃঃ ইহুদী সরকার পশ্চিম দেয়ালের নীচের গর্ত আরো সম্প্রসারিত করে এবং ঐ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) প্রখ্যাত সাহাবীদ্বয় উবাদাহ বিন সামেত এবং শাদ্দাদ বিন আওসের (রা) কবর থেকে তাঁদের হাড়গোড় সরিয়ে ফেলে।

৭ম পর্যায় ঃ ১৯৭৭ খৃঃ মসজিদে আকসার আঙিনায় অবস্থিত মহিলাদের মসজিদের নীচ পর্যন্ত খনন করা হয়। তারা ৯ মিটার গভীরে খনন করে। মসজিদের আঙিনার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মুসলিম বাড়ী-ঘরগুলো ভেঙে সেখানেও খনন কাজ চালানো হয়।

৮ম পর্যায় ঃ ১৯৭৯ খৃঃ মসজিদে আকসার পশ্চিম দেয়ালের নীচে বোরাক দেয়ালের পাশে খনন করা হয়। ইহুদী সরকার সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করে এবং খননকার্য আরো অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে করে পশ্চিম থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত মসজিদের পুরো এলাকাব্যাপী উক্ত সুড়ঙ্গ সম্পন্ন হয়। পরে ইহুদীরা সুড়ঙ্গটিকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে এবং তাতে ছোট একটি ইহুদী উপাসনালয় নির্মাণ করে। ইসরাইলের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী তাকে ইহুদীদের অস্থায়ী ইবাদতগাহ হিসেবে উদ্বোধন করেন।

৯ম পর্যায় ঃ ১৯৮৬ খৃঃ মসজিদে আকসার চারদিকে খননকাজ করা হয় এবং পুরাতন জেরুসালেম শহর থেকে বিরাটসংখ্যক মুসলিম নাগরিককে উচ্ছেদ করা হয়। সেখানকার ফিলিস্তিনী হাসপাতালটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

১০ম পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে মারাত্মক খননকাজ চালানো হয়। ইহুদীরা মসজিদে আকসার আঙিনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নীচে খনন করতে চাইলে মসজিদের নিরস্ত্র মুসলিম রক্ষীরা তাতে বাধা দেয়। তখন তারা মসজিদের বেষ্টনী দেয়ালের বাইর থেকে খনন কাজ শুরু করে। উল্লেখ্য যে, বেষ্টনী দেয়ালের বাইরের মুসলিম এলাকাগুলো আগেই খালি করা হয়েছে এবং সেগুলো ইসরাইলী সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেখান থেকে তাদের খনন কাজ শুরু করতে বাধা নেই। ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে, ইহুদীরা মসজিদ সংলগ্ন ওয়াদী এলাকা থেকে মসজিদ আকসাগামী রাস্তার মাঝামাঝি খনন শুরু করে। মসজিদের মুসলিম রক্ষীরা তাতে বাধা দেয়। কিন্তু খননকারীরা খনন

অব্যাহত রাখে। খননকারীদের উক্ত খনন কাজের উদ্দেশ্য ছিল মসজিদে সাখরার নীচের মূল ভিত্তি পর্যন্ত পৌছা। তারপর মসজিদে আকসার পূর্ব দেয়ালের নীচে আরেকটা সুড়ঙ্গ খনন করা। জেরুসালেমের ইসলামী ওয়াকফ বিভাগ ষড়যন্ত্রটি বুঝতে পেরে খনন কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মসজিদের পূর্ব দেয়াল সংলগ্ন বাইরের যমীনের উপর একটা বেড়া নির্মাণ করে। ইসরাইল সরকার বেড়া দেখে তা সরিয়ে ফেলার হুমকি দেয় এবং অজুহাত দেখায় যে, তা বিনা অনুমতিতে নির্মাণ করা হয়েছে। ইসলামী ওয়াকফ বিভাগের পরিচালক এর জবাবে বলেন, এটা যেহেতু ওয়াকফ বিভাগের সম্পত্তি, সেহেতু তাতে বেড়া দেয়ার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। ওয়াকফ বিভাগের ঐ জবাবের প্রেক্ষিতে ইসরাইল সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং সেই মামলা ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে। ১০ম পর্যায়ের খনন কাজ হচ্ছে সবচাইতে মারাত্মক কাজ। কেননা, এর উদ্দেশ্য হল মসজিদে আকসা ও সাখরার নীচ থেকে সকল মাটি ও পাথর সরিয়ে ফেলা। যাতে করে মসজিদ ২টা কোন রকম দাঁড়িয়ে থাকলেও যে কোন সময় ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে ধসে পড়ে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইহুদীরা হাইকালে সুলাইমানীর নিদর্শন খুঁজে পাওয়ার জন্য মসজিদে আকসায় যে খননকার্য পরিচালনা করছে, তা কতটুকু যুক্তিসংগত? ইহুদী প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলছে, মসজিদে আকসা ও সাখরা এবং এই দুইটির আঙিনার নীচে হাইকালে সুলাইমানীর প্রত্নতাত্ত্বিক কোন নিদর্শনের অস্তিত্ব নেই। কোন কোন ইহুদী প্রত্নতবিদ বলেছে, হাইকাল আছে, তবে কোথায় আছে, তারা তা জানে না। তাহলে, উক্ত খননকার্যের উদ্দেশ্য মসজিদে আকসা ও সাখরা ধ্বংস করা ছাড়া আর কি হতে পারে?

অন্যান্য আগ্রাসন

'৬৭-এর জুন মাসে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইহুদীরা মসজিদে আকসার কয়েকটি জানালা ভেঙে ফেলে মসজিদের ক্ষতিসাধন করে। ১১/৬/১৯৬৭ খৃঃ ইহুদীরা বোরাক দেয়ালের সামনের মুসলিম বসতি ভেঙে ফেলে এবং তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

২৭/৬/৬৭ খৃঃ জেরুসালেমে হাখাম ইহুদীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা জেরুসালেম ও হাইকালে সুলাইমানীর বিষয়ে আলোচনা করে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা শীঘ্র ৩য় হাইকাল নির্মাণের উপর জোর দেয়।

১৫/৮/৬৭ সালে, ইসরাইলের বড় হাখাম এবং ইসরাইলী সেনাবাহিনীর হাখাম শ্লোমোগোরিন ২০ জন সামরিক অফিসারকে সাথে করে সামরিক পোষাকে মসজিদে আকসার আঙিনায় প্রবেশ করে এলোপাথাড়ি গুলী ছুড়ে আতংক সৃষ্টি করে এবং পরে ইহুদী প্রার্থনা আদায় করে।

প্রায় প্রত্যেক বছর আগস্ট মাসে ইহুদীরা মসজিদে আকসায় আক্রমণ করে। কেননা, ৭০ খৃস্টাব্দের ২১শে আগস্ট, তাইতুস ২য় হাইকাল ধ্বংস করে। ইহুদীরা সেই দুঃখজনক স্মৃতির কারণে আগস্ট মাসে বেশী আক্রমণ চালায়।

১৯৬৭ সালের ৩১শে আগস্ট ইহুদীরা জোর করে মসজিদে আকসার প্রধান গেইট বাবুল মাগরেবার চাবি নিয়ে যায়, যেন তারা যে কোন সময় বোরাক দেয়ালের কাছে যেতে পারে। তারা এটাকে 'মাবকী দেয়াল' বলে। ইহুদীরা ইসরাইলী সেনাবাহিনীর বড় হাখাম শ্লোমোগোরিনের সহায়তায় ঐ চাবি জোর করে হস্তগত করে। এইভাবে তারা মসজিদে আকসার অপবিত্রতা সাধন করে।

১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট ডেনিস মাইকেল নামক জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান খৃস্টান মসজিদে আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। অন্য এক বর্ণনায় মিখাইল রোহান নামক একজন ইহুদী অগ্নি সংযোগ করে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে মসজিদের আসবাবপত্র, দেয়াল, সালাহউদ্দিনের মিম্বার এবং মসজিদের দক্ষিণাংশ পুড়ে যায়। ইসরাইলী প্রশাসন দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করে। আদালত তার রায়ে বলে যে, যা ঘটেছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রেরিত ব্যক্তির কাজ ও হযরত যাকারিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন মাত্র। অগ্নিসংযোগকারী ব্যক্তি পাগল, তাই তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি কার্যকর করা যায় না। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা গঠিত হয়।

১৯৭১ সালের ১১ই মার্চ আল-হারহাশেম দলের নেতা জরশন স্যালমন, গোঁড়া একজন ইহুদী ছাত্রকে সাথে করে মসজিদে আকসায় ইহুদী প্রার্থনা আদায় করে। এর ফলে জেরুসালেমে গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

১৯৭৬ সালের ৩০ শে জানুয়ারী একটি ইসরাইল আদালত মসজিদে আকসার আঙিনায় দিনের যে কোন সময় ইহুদী প্রার্থনা অনুমতি দেয়। এর আগে ৪০ জন ইহুদী জোর করে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে ইহুদী গান গায় ও মুসলমানদের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এর ফলে মসজিদের আঙিনায় মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের সংঘর্ষ হয়।

১৯৭৮ সালের ১৪ই আগস্ট আল-হারহাশেম দলের নেতা জরশন স্যাশমনের নেতৃত্বে একদল ইহুদী মসজিদে আকসায় প্রার্থনা জানায়। এতে মসজিদের

প্রহরীরা বাধা দেয়। ১৯৮০ সালের ১লা মে ইহুদীরা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা মসজিদের নিকটবর্তী একটি ইহুদী গীর্জার ছাদের উপর এক টনেরও বেশী বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে দেয়। ইহুদী স্কুল বাশিফায়ও একই উদ্দেশ্যে তারা আকেবার বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে যায়। মুসলমানদের সতর্কতার কারণে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই অপরাধে সন্ত্রাসবাদী মায়ের কাহানাকে অভিযুক্ত করা হয়।

১৯৮১ সালের ৯ই আগস্ট ইহুদী সংস্থা জোশ ইমুনিয়ামের ৩ শত সদস্য মসজিদের বাবুল হাদীদের তালা ভেঙে তাতে প্রবেশ করে ও মুসলামানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে ইহুদী প্রার্থনা আদায় করে।

১৯৮১ সালের ২৫শে আগস্ট একটি ইহুদী ধর্মীয় সংস্থা বোরাক দেয়াল থেকে মসজিদের আঙিনা পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করে এবং দাবী করে যে, এর সাথে ২য় হাইকালের সম্পর্ক রয়েছে। এর ভিত্তিতে তারা খননকাজ শুরু করায় মসজিদের দেয়াল ধসে পড়ার উপক্রম হয়।

১৯৮২ সালের ২রা মার্চ হাইকাল পাহাড় সচিবালয় সংস্থার ১৫ জন ব্যক্তি মসজিদে আকসার বাবুস সিলসিলাহ গেইটে সশস্ত্র আক্রমণ করে। তারা ভেতরের রক্ষীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। একজন মুসলিম রক্ষী পেটের বাম পার্শ্বে ছুরিকাহত হন। পরের দিন মুসলমানগণ এই উত্তেজনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ পুরো জেরুসালেম, অধিকৃত পশ্চিম তীর, গাজ্জা, নাবলুস এবং বেথেলহেমে ধর্মঘট আহবান করে।

১৯৮২ সালের ৩রা মার্চ বাবুল গাওয়ানেমা দিয়ে একদল ইহুদী যুবক মসজিদে আকসায় হামলা চালায় এবং মসজিদের রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে একজন মুসলিম রক্ষী আহত হয়। ইসরাইলী পুলিশ আক্রমণকারী ইহুদী যুবকদেরকে আটক না করে আহত রক্ষীকে আটক করে এবং অন্যান্য রক্ষীদের কাছ থেকে উল্টা কৈফিয়ত তলব করে।

১৯৮২ সালের ৮ই এপ্রিল মুসলমানগণ মসজিদের একটি প্রধান গেইটের পেছনে সন্দেহজনক একটি প্যাকেট দেখতে পায়। প্যাকেট খোলার পর তাতে বৈদ্যুতিক তার ও রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র পাওয়া যায়। তা থেকে মসজিদের ওয়াকফ কাউন্সিলের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিও উদ্ধার করা হয়। চিঠিতে লেখা ছিল, "তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের অধিকতর তৎপরতার অপেক্ষা কর।" পরেদিন মুসলমানগণ জুমুআর নামায আদায় করে এবং ঐ হুমকির কারণে তারা মসজিদে অবস্থান করে। ১৯৮২ সালের ১১ই এপ্রিল, এলান গডম্যান

নামক একজন ইসরাইলী সৈন্য বাবুল গাওয়ানেমায় এসে রক্ষীর উপর গুলী ছুড়ে তাকে আহত করে। তারপর মসজিদে সাখরার দিকে দৌড়ে যায় ও এলোপাথাড়ি গুলী ছুড়তে থাকে। ফলে, কয়েকজন মুসল্লী আহত হয় ও মসজিদের একজন রক্ষী শহীদ হন। মসজিদের পার্শ্ববর্তী ঘরসমূহের উপর অবস্থান গ্রহণকারী ইহুদী সৈন্যরা মসজিদে সাখরার দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়তে থাকে। মসজিদের মুআয্যিন মসজিদের মাইক্রোফোনে মুসলমানদের প্রতি মসজিদের প্রতিরক্ষার জন্য এগিয়ে অসার আহ্বান জানান। মুসলমানগণ দ্রুত প্রতিরক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। মসজিদের পার্শ্ববর্তী বাড়ীসমূহের ছাদ থেকে ইসরাইলী সৈন্যরা গুলী ছোড়ে। ফলে প্রায় ১শ' ব্যক্তি আহত হয়। জেরুসালেমের মুফতী শেখ সাদউদ্দিন এলমী ঐ ঘটনার জন্য ইসরাইল সরকারকে দায়ী করেন। তখন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মানাচেম বেগিনের অফিস থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'মুফতীর যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং সেই যুগ আর ফিরে আসবে না।' বিশ্বব্যাপী এই ঘটনার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করা হয়। ২০/৪/১৯৮২ সালে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হয় এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে খসড়া নিন্দা প্রস্তাবের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগের কারণে তা নাকচ হয়ে যায়।

১৯৮২ সালের ২৭শে এপ্রিল ইহুদী কাখ আন্দোলনের নেতা হাখাম মায়ের কাহানার নেতৃত্বে ১শ' ব্যক্তি মসজিদে আকসা আক্রমণ করে এবং ফিলিস্তিনী মুসলমানদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করার শ্লোগান দেয়।

১৯৮২ সালের ২৯শে এপ্রিল, ৩০ জন সশস্ত্র ইহুদী মসজিদে আকসায় জোর করে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু মসজিদের প্রহরীরা বাধা দেয়ায় তারা ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি।

১৯৮২ সালের ৬ই মে, অজ্ঞাত ব্যক্তিরা মসজিদে সাখরার গম্বুজের প্রতি গুলী ছুড়তে থাকে। রক্ষীরা মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেন। জানা গেছে যে, নব প্রতিষ্ঠিত ইহুদী বসতির একজন ইহুদী নাগরিক মসজিদের নিকটবর্তী স্কুলের উপর থেকে মসজিদের প্রতি গুলী ছোড়ে।

১৯৮২ সালে ইহুদী কাখ আন্দোলনের সদস্য ইয়াসরাইল লারনার তার গোপন সংস্থার কয়েকজন যুবককে নিয়ে মসজিদে সাখরা বিস্ফোরিত করতে চেয়েছিল। এছাড়াও তারা জেরুসালেমের অন্যান্য মসজিদগুলোও ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। একই সালে রবি আর্নেল তার ২০ জন ছাত্র নিয়ে মসজিদে আকসা ধ্বংস করার চক্রান্ত করে।

১৯৮৩ সালে রাবী যালমান কোরনের শিষ্যরা মসজিদে আকসা আক্রমণ করে। তাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত বিচারে ইহুদী বিচারপতি তাদেরকে বেকসুর খালাস দেয় এবং তাদেরকে আটক করার দায়ে পুলিশকে অভিযুক্ত করে।

১২/৩/১৯৮৩ সালে হাখাম মায়ের কাহানার দলের ৪২ ব্যক্তি মসজিদে আকসা পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে তারা ব্যর্থ হয়। ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে ওমানা হাইকাল সংস্থার একদল ইহুদী মসজিদে আকসার বোরাক দেয়ালের কাছে প্রার্থনা জানায় ও মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী সন্ত্রাসবাদী ইহুদীচক্র ২৯ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্যের মাধ্যমে মসজিদটি ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। একই সালের ২৭শে জুলাই পুনরায় তারা মসজিদ ধ্বংসের অনুরূপ উদ্যোগ নেয়। কিন্তু মসজিদের রক্ষীদের সতর্কতার কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৮৫ সালের ১২ মার্চ ইহুদী চরমপন্থী দলগুলোর কিছু লোক নতুন ইহুদী বসতি এবং ইহুদী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে মসজিদে আকসার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর হামলা চালায়।

১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে একজন চরমপন্থী ইহুদী মসজিদের দিকে নিজ গাড়ী চালিয়ে তার ক্ষতি করতে চেয়েছিল। ১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে মসজিদে আকসার রক্ষীরা মসজিদের আঙিনায় কিছু সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী ইহুদীকে দেখতে পায় যে তারা মসজিদটি পুরোপুরি ধ্বংসের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের সাথে ছিল ১২০ কেজি টিএনটি বিস্ফোরক দ্রব্য। মুসলমানগণ সেই প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়। জেরুসালেমের মুফতি শেখ সাদউদ্দিন এলমী বলেছেন, আল্লাহর রহমত না হলে মসজিদের একটি পাথরও অবশিষ্ট থাকত না।

১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে অন্য একদিন ইহুদীরা তদানীন্তন ইসরাইলী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইউসুফ বোজের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে মসজিদের আঙিনায় ইসরাইলী পতাকা উত্তোলন করে। এর তিন সপ্তাহ আগেও তারা একবার পতাকা উত্তোলন করেছিল। কিন্তু জেরুসালেমের ইসলামী কাউন্সিলের প্রতিবাদের মুখে তারা তা নামাতে বাধ্য হয়।

১৯৮৪ সালের ৭ই আগস্ট ইহুদী হাখাম আন্দোলনের নেতা মায়ের কাহানা মসজিদে আকসাকে অপবিত্র করার চেষ্টা করে। সে মসজিদের একটি দরজায়

ইসরাইলী পতাকা উত্তোলন করে। দ্বিতীয় হাইকাল ধ্বংসের স্মরণে সেদিন হাজার হাজার ইহুদী প্রার্থনা জানায়।

১৯৮৪ সালের ৯ই আগস্ট ইসরাইল কর্তৃক মসজিদে আকসার কাছে একটি জেলখানা তৈরির খবর প্রকাশিত হয়। মসজিদের কাছে জেলখানা তৈরির উদ্দেশ্য পরিষ্কার। আর সেটা হল, মসজিদের মুসলিম মুসল্লীদেরকে তাতে আটক রাখা।

১৯৮৪ সালের ২৭শে আগস্ট জেরুসালেমের একটি গর্তে বিপুল পরিমাণ গোপন অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বে জেরুসালেমের একটি স্থানে চরমপন্থী এক দল ইহুদী ঐ সকল অস্ত্র গোপন রাখে। একজন মুসলিম পথচারী তা দেখতে পান। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য ঐ গোপন অস্ত্রের মওজুদ গড়ে তোলা হয়।

১৯৮৪ সালের ২৮শে আগস্ট বিস্ফোরণের মাধ্যমে মসজিদে আকসা ধ্বংসের চেষ্টার দায়ে একজন ইসরাইলী ছাত্রকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা চলতে থাকে।

১৯৮৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর একদল সশস্ত্র ইহুদী মসজিদে আকসার আঙিনায় বোমা রাখে। মসজিদ রক্ষীরা তা দেখতে পেয়ে তার কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। পরের দিন এর প্রতিবাদে গোটা জেরুসালেম হরতাল পালন করা হয়।

১৯৮৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ইসরাইলী নেসেটের ২০ জন সদস্য হাখাম ইলিআজের ফালদামের নেতৃত্বে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে মসজিদের অপবিত্রতা সাধন করে।

১৯৮৬ সালের ৯ই জানুয়ারী ইসরাইলী সেনাবাহিনীর সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মসজিদে আকসা এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করে। ইসরাইলী নেসেটের আভ্যন্তরীণ কমিটির ৮ সদস্যসহ আরো কিছু নেসেট সদস্য এবং টেলিভিশনের ফটোগ্রাফার মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে। মসজিদের রক্ষীরা বাধা দিলে তাদেরকেসহ কিছু মুসল্লীকে আটক করে এবং ইসরাইলী বাহিনী মুসল্লীদের উপর কাঁদানে গ্যাস ও গোলা নিক্ষেপ করে। ফলে ১৬ জন মুসল্লী আহত হয়। মসজিদে আকসায় প্রবেশের জন্য এটাই হচ্ছে সরকারীভাবে প্রথম প্রচেষ্টা।

১৯৮৬ সালের ৩রা এপ্রিল ইসরাইলী পুলিশ জোরপূর্বক মসজিদের একটি দরজা তুলে ফেলে। মসজিদ-রক্ষীরা রাত্রে ইহুদীদের অনুপ্রবেশ বন্ধের উদ্দেশ্যে এ দরজাটি নির্মাণ করেছিলেন।

১৯৮৬ সালের ২শে এপ্রিল 'ওমানা জাবাল আল-বাইত' ইহুদী সংস্থার একদল লোক মসজিদে আকসায় অনুপ্রবেশ করে এবং জরশন স্যালমনের নেতৃত্বে প্রার্থনা করে।

১৯৮৬ সালের ৬ই জুন জোশ ইমুনিয়ামের ৩ জন সদস্য মসজিদে আকসায় অনুপ্রবেশ করে।

১৯৮৬ সালের ২১শে আগস্ট ওমানা জাবাল আল-বাইত এবং হাতহিয়া সংস্থার লোকেরা ইসরাইলী পুলিশের সহায়তায় মসজিদে প্রবেশ করে এবং মুসলমানদের ঈদুল আযহা উদযাপন উপলক্ষে ইহুদী প্রার্থনা জানায়।

১৯৮৭ সালের ৪ঠা আগস্ট ৩ জন ইহুদী মসজিদে আকসায় বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

১৯৮৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী ইসরাইলী বাহিনী মসজিদে আকসায় গুলী চালিয়ে ২৮ জন মুসল্লীকে হত্যা করে এবং ১১৫ ব্যক্তিকে আহত করে।

১৯৮৯ সালের ১৭ই মার্চ মুসলিম রক্ষীরা মসজিদের ভেতর কতগুলো বোমা দেখতে পায়। একটি ইহুদী সংস্থা মসজিদ ধ্বংসের জন্য ঐ বোমাগুলোকে ভেতরে রেখে দেয়।

১৯৮৯ সালের ১৭ই অক্টোবর ওমানা হাইকাল সংস্থার লোকেরা মসজিদের গেইটের কাছে ৩য় হাইকালের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ভিত্তিতে ৩.৫ টন ওজনের পাথর লাগায়। দলের নেতা জরশন স্যালমন বলেন, "হাইকালের ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। আজ ইসলামের জবরদখলের অবসান হল এবং ইহুদীদের মুক্তির নতুন যুগের সূচনা হল।"

১৯৯০ সালের ৮ই অক্টোবর মসজিদের মুসলিম মুসল্লীরা ইহুদীদেরকে প্রবেশে বাধা দিলে ইসরাইলী সেনাবাহিনী তাদের উপর গুলী চালায়। ফলে ২০ জন মুসলমান শহীদ ও ১০০ জন আহত হয়।

১৯৯১ সালে শেষার্ধে পূর্ব জেরুসালেমের সালওয়ান এলাকায় ৬টি মুসলিম পরিবারকে বিতাড়িত করা হয় এবং সেগুলোতে পরে বিদেশাগত ইহুদীদেরকে পুনর্বাসন করা হয়।

বিদেশী ইহুদী পুনর্বাসন ষড়যন্ত্র

ইসরাইল ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ৪০ লাখ ইহুদীকে ইসরাইল পুর্বাসন করার কর্মসূচী ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালের জুন মাসে ইথিওপিয়া থেকে ২৬ হাজার ফালাসা ইহুদীকে ইসরাইলে পুনর্বাসিত করা হয়। ইসরাইল গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদীদেরকে ইসরাইলে পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

ইসরাইল সরকার অধিকৃত আরব এলাকা ইহুদীকরণের উদ্দেশ্যে ইহুদী বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। একমাত্র পূর্ব জেরুসালেম শহরেই ৭০ হাজার ইহুদীকে পুনর্বাসনের জন্য ২০ হাজার আবাসিক ইউনিট তৈরির পরিকল্পন নিয়েছে। যাতে করে পূর্ব জেরুসালেমে ইহুদীর সংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজারে পৌঁছে এবং মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কেননা, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে দেড় লাখ। এছাড়াও ইসরাইল উত্তর জেরুসালেমে ১২ হাজার আবাসিক ইউনিট এবং দক্ষিণ জেরুসালেমে সাড়ে ৭ হাজার আবাসিক ইউনিট তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছে।

ইসরাইল সরকারের ইহুদী বসতি স্থাপনের অর্থ যোগান দিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন ইহুদী সংস্থা এবং সবচাইতে বড় অর্থ যোগাদানকারী দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে ৩ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। ফলে, এত বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

হাইকালে সুলাইমানী তৈরির জন্য ইসরাইলের সকল আয়োজন শেষ পর্যায়ে। এ জন্য মসজিদে আকসার চারপাশে যা যা করা দরকার সবকিছু তারা করেছে। মুসলিম বসতি উচ্ছেদ করে ইহুদী বসতি স্থাপন, মুসলমানের চাইতে ইহুদী জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা, মুসলমানদের জমিন হকুম দখল করা, মোট ১১ বার খনন কাজ করা, মুসলিম কবরস্থান উচ্ছেদ করা, হাইকালে সুলাইমানীর নতুন ভিত্তি স্থাপন করা ইত্যাদি। সেজন্য যে বাধা আসবে, গুলীর মাধ্যমে তার মোকাবিলা করা এবং মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলাও শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও মসজিদে আকসা ধ্বংসের চেষ্টা ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে। যে কোন সময় বড় ধরনের একটি উদ্যোগ নেয়াই যথেষ্ট এবং এটাই তাদের অবশিষ্ট কাজ।

জেরুসালেমের উপর ইহুদী দাবীর ভ্রান্তি

জেরুসালেমের সর্বোচ্চ ইসলামী কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং ফিলিস্তিন জাতীয় সংসদের স্পীকার আবদুল হামীদ আস-সায়েহ বলেছেন, "জেরুসালেমের উপর ইসরাইলীদের কোন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় অধিকার নেই।"[৩৮]

আল্লাহর বিশেষ কুদরত হল, হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পরবর্তী নবী ছিলেন। ইসলাম সকল নবীর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছে। তাই হযরত সুলাইমান (আ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদে আকসা আজ মুসলমানদেরই স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। সেখানে ইহুদী জাতির ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অধিকার কিংবা ঐতিহ্যের আবদার চলে না। কেননা হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ) ইহুদীদের সরাসারি নবী নন। বরং মুসলমানরাই হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ)-এর যথার্থ উত্তরাধিকারী।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, হযরত মূসা (আ)-এর উপর তূর পাহাড়ে তাওরাত নাজিল হলেও তিনি ফিলিস্তিনে বাস করেননি এবং ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সম্ভবও হয়নি। সেই কারণে 'জেরুসালেম তাওরাত কিংবা ইহুদীদের ভূমি' সংক্রান্ত ইসরাইলী দাবী অর্থহীন। বরং হযরত মুহাম্মাদ (সা) বাইতুল মাকদিস থেকে মেরাজে যাওয়ার কারণে তা ইসলামেরই পবিত্র স্থান ও পুণ্যভূমি।

মসজিদে আকসার বর্তমান প্রয়োজন

সম্প্রতি অধিকৃত আরব এলাকার 'লাজনাতুল কুদ্স ওয়াদ দেফা আনিল মুকাদ্দাসাত' (জেরুসালেম ও পবিত্র স্থান প্রতিরক্ষা কমিটি) এক মারাত্মক রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছে, মসজিদে আকসা এবং সাখরা ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তাই মসজিদ আকসাকে রক্ষা করা খুবই জরুরী। কমিটি যে সকল ক্ষেত্রে কাজ করার চেষ্টা করছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. পুরাতন জেরুসালেম শহরের ভূমির প্রতিরক্ষা কেননা, পুরাতন জেরুসালেম শহরকে ইহুদীকরণ এবং সেখানে পরিকল্পিত ইহুদী বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাই প্রতিদিন পুরাতন শহরের মুসলিম সম্পত্তি ও জায়গার উপর ইহুদী আগ্রাসন চলছে। ইহুদীরা মুসলিম সম্পত্তি দখল করার উদ্দেশ্যে বিরাট তহবিল সৃষ্টি ও পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং আইনের আশ্রয়ে

---

৩৮. দৈনিক আল-মদীনাহ, জেদ্দা- ২৫ মে, ১৯৯২।

সেগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। কোর্টে ইহুদীদের বিরুদ্ধে মামলা ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিরাট অংকের অর্থের প্রয়োজন।

২. পুরাতন শহরের মুসলিম ঘর-বাড়ীর হেফাজত করা । রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঐ সকল ঘরগুলোর বয়স শত শত বছর। ঐগুলোর প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না। অনেক বিল্ডিং-এর ইট খসে যাচ্ছে, দেয়াল ফেটে যাচ্ছে এবং ইহুদীদের ব্যাপক খননকার্যের ফলে ভবনগুলোর ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই ঘরগুলোকে ঠিক করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ঃ (ক) কমিটির প্রকৌশলীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঘরগুলোর মেরামত করা। এ জন্য বিরাট অংকের অর্থ প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণের সেই রকম আর্থিক সামর্থ্য নেই যে, এত টাকা খরচ করে তারা নিজেদের ঘর মেরামত করতে পারে। (খ) ঘরের ফাটল সংস্কারের জন্য মালিকদেরকে নির্মাণসামগ্রীর সাহায্য দেয়া (গ) প্রতিরক্ষামূলক বেষ্টনী দেয়াল, জানালা ও দরজা পুনঃনির্মাণ এবং সেগুলোতে লোহা ব্যবহার করা। (গ) পরিত্যক্ত বাড়ীঘরগুলো আবাদ করা, এই সকল বাড়ী-ঘরের মালিকেরা এগুলো সংস্কার করতে না পেরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। কমিটি সেই সকল বাড়ী-ঘরের মালিকদের সাথে যোগাযোগ করে মেরামত করছে এবং চুক্তির ভিত্তিতে গরীব-মিসকীনদেরকে তাতে বাস করার সুযোগ দিচ্ছে কিংবা সেগুলো ভাড়া দিচ্ছে। এগুলোর উপর 'জেরুসালেম ওয়াকফ কমিটির' তদারকীর চুক্তির শর্ত রয়েছে। এই কাজের জন্য কমিটির বিরাট অংকের টাকা দরকার। (ঘ) বড় বড় ঐতিহাসিক ভবনগুলোর সংস্কার ও মেরামত করে তা বসবাসের উপযুক্ত করা হচ্ছে।

৩. পুরাতন শহরের যে সকল জমিন ইহুদী বসতির হুমকির সম্মুখীন, এর মোকাবিলায় কমিটি সে সকল জমিন কিনে তা মুসলমানদের কবজায় রাখার চেষ্টা করছে। এ জন্যও বিরাট তহবিল প্রয়োজন।

৪. পুরাতন শহরে বসবাসরত মুসলিম পরিবারগুলোকে সমাজকল্যাণমূলক সেবা দান করতে হচ্ছে। তাদেরকে শহরে টিকিয়ে রাখার জন্য এই সেবা অত্যন্ত জরুরী।

৫. কমিটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করে, পুরাতন শহরের লোকদেরকে জেরুসালেমের বেষ্টনী দেয়ালের ভেতর প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্যোগ নিয়েছে। শহরে এক মিটার জায়গাও এমন নেই, যেখানে হয় ইসরাইলী পুলিশ কিংবা একজন পুনর্বাসিত ইহুদী নেই। কমিটি বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে চিকিৎসা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে এবং মুসলিম নাগরিকদেরকে চিকিৎসা প্রদান করছে।

৬. চিকিৎসা সেবা ঃ কমিটি পৃথক চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মুসলিম নাগরিকদেরকে বিনামূল্যে কিংবা প্রতীকী মূল্যে চিকিৎসা সেবা দান করছে।

৭. মসজিদে আকসা ও সাখরার রক্ষীদের সাংসারিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী বেতন-ভাতা দেয়া দরকার। সেজন্য কমিটি চেষ্টা করছে তবে এ ব্যাপারে কমিটিকে সহযোগিতা করা দরকার।

জেরুসালেম ও মসজিদে আকসা উদ্ধারের সঠিক উপায়

জেরুসালেম ও ফিলিস্তিন মুক্ত করার আন্দোলন চলছে। ফিলিস্তিনীরা প্রতিরোধ আন্দোলন করছে। কিন্তু তাদের মুক্তি আন্দোলনগুলো সবই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের কথা বলছে। অনেকগুলো পৃথক পৃথক মুক্তিসংস্থা সম্মিলিত প্রতিরোধ আ্যান্দোলনের ধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গড়ে তুলেছে ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন। এটি একটি ফেডারেশন। সকল মুক্তিসংগঠনগুলো এর সদস্য। কিন্তু তারা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। সাথে রয়েছে জেরুসালেমকে রাজধানী করার ঘোষণা। ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে জর্দান থেকে ইসরাইলের কেড়ে নেয়া জর্দান নদীর পশ্চিমতীর ও গাজ্জা এলাকা নিয়ে জেরুসালেমকে রাজধানী করে তারা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করতে চায়।

প্রশ্ন হল, যদি ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইসরাইল থেকে পৃথক হয়ে খুব একটা লাভ হবে না। আলোচনা করলে ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবে। সেক্ষেত্রে পৃথক ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সত্যিকার প্রয়োজন থাকে না।

ইসলামের লালনভূমি ফিলিস্তিনে অবশ্যই ইসলাম কায়েম করতে হবে। কেননা, সেখানেই হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, হারুন, ইউশা, দাউদ, সুলাইমান, যাকারিয়া এবং ঈসা (আ)-এর আগমন ঘটেছে। সেই জমিনের প্রতিটি বালুকণা ইসলামী আদর্শের বাস্তব স্বাক্ষর। স্বয়ং মহানবী মুহম্মাদ (সা)-এর মে'রাজের কারণে যে বাইতুল মাকদিস ধন্য হয়েছে, সেই জেরুসালেম ভিত্তিক ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আদর্শ হবে ইসলাম, অন্য কোন মতবাদ নয়। সকল ফিলিস্তিনী এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার।

পক্ষান্তরে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধ আন্দোলন ৪০ বছর যাবত চলছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ উক্ত মুক্তি আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে জেরুসালেম ও ফিলিস্তিনের মুক্তি আসেনি।

তাই আজ ফিলিস্তিনীদের দ্বীনি অংশের মধ্যে ইসলামের পুনর্জাগরণের অনুভূতি এসেছে এবং ইসলামকে তারা মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছে। হামাস নামক মুক্তি সংস্থা দলীয় আদর্শ হিসেবে ইসলামের কথা ঘোষণা করায় অধিকৃত ফিলিস্তিনের জনগণের মধ্যে সাড়া পড়েছে। হামাসের আহ্বানে ১৯৮৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর থেকে গোটা অধিকৃত ফিলিস্তিনে চলছে ইসরাইল বিরোধী গণ-আন্দোলন বা ইন্তেফাদা। এই ইন্তেফাদার কারণে বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিনী সমস্যার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মধ্যপ্রাচ্য তথা ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ফিলিস্তিন ও বাইতুল মাকদিসকে পুনরুদ্ধারের জন্য আপাততঃ যে সকল চেষ্টা চলছে সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার উদ্যোগে জেরুসালেম কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা জেরুসালেমকে রক্ষার বিষয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রচেষ্টা ও ভূমিকার সমন্বয় সাধন করছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দুর্বল বলে জেরুসালেম কমিটি নিন্দা প্রস্তাব ও দুঃখ প্রকাশ ছাড়া বাস্তবে তেমন কিছুই করতে পারছে না।

২. ফিলিস্তিনী ইন্তেফাদা বা গণ–আন্দোলন ঃ

ফিলিস্তিনী মুসলমানগণ হানাদার ইহুদীদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তারা গোটা অধিকৃত ফিলিস্তিনে, ফিলিস্তিনী গণ-জাগরণ বা ইন্তেফাদা গড়ে তুলেছে। ইহুদীদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা থেকে শুরু করে বোমা নিক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু শত্রুর কঠোর নির্যাতন ও প্রতিরোধের মুখে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী জনগণ সামরিক সাফল্য লাভ করতে পারছে না। উল্লেখ্য যে, ৫০ লাখ ফিলিস্তিনী মুসলিম নাগরিকের মধ্যে প্রায় ২০ লাখ হচ্ছে অধিকৃত ফিলিস্তিনে। আর অবশিষ্টরা ফিলিস্তিনের বাইরে বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও দেশে বাস করছে।

৩. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইহুদীদের প্রভাবান্বিত। কেননা, এর সদস্যদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃটেন এবং ফ্রান্স নির্লজ্জভাবে ও প্রকাশ্যে ইহুদীদের সকল অন্যায় কাজ অব্যাহত রাখার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে।

তবে সর্বাগ্রে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সে ইসরাইলের অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে কোন নিন্দা প্রস্তাব পাশ হতে দেয় না। তাতে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং ও ৩৩৮ নং প্রস্তাবে, অধিকৃত ফিলিস্তিন থেকে ইসরাইলী জবরদখল প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ইসরাইলী বাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাব বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। নিরাপত্তা পরিষদ তা করছে না।

এমতাবস্থায় নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজস্ব শক্তি-সমন্বিত করে ইসলামের ভূমি উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হওয়াই মুসলিমের কর্তব্য। মুসলমানদের আরো করণীয় হল, জেরুসালেম মুক্ত করার জন্য ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেয়া। জেহাদ ছাড় অন্য কোন উপায়ে মসজিদে আকসাকে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। গত ৪০ বছর যাবত বিভিন্ন উপায়ে বহু চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু কোন ফলোদয় হয়নি। তাই আজ মুসলিম দেশ সমূহের সরকারগুলোর উচিত, ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে জেহাদের কর্মসূচী হাতে নেয়া।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তিনি বলেছেন, এমন একদিন আসবে যখন ইহুদীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হবে। এমনকি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ইহুদীকে গাছ দেখিয়ে দিয়ে বলবে, তাকে হত্যা কর।'

সমাপ্ত